কবি-কথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর



সুপ্রকাশন
৩, সার্কাস রেঞ্জ
কলিকাতা ১৯

প্রথম সংস্করণ ১৯৫১

প্রকাশক ঃ
শ্রীনিখিল দত্ত
৩, সার্কাস রেঞ্জ
কলিকাতা ১৯

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীসুধীর মৈত্র

মুদ্রক ঃ
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তিপ্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

দাম সাড়ে তিন টাকা

‘খুকুমণি’কে

জন্ম ১৩৪৮ সন, ১৬ ফাল্গুন, শনিবার

মৃত্যু ১৩৫৮ সন, ৩০ আশ্বিন, বুধবার

ভূমিকা

তেইশ বছর আগেকার কথা। ১৩৩৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে গ্রন্থাগারের কর্মীরূপে আমি শান্তিনিকেতনে আসি। ছ-মাস পর। সেদিন বুধবার। মন্দিরের উপাসনা সেরে পাশেই কুটীরের বারান্দায় কবি বিশ্রাম করছিলেন। সামনের পথ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলাম কবি ডাকলেন। বললেন—আমার ওখানে তোমার থাকতে হবে। কাল থেকে এসো। অমিয়র কাছে (শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী) কাজ বুঝে নিয়ো। কবির খাসদপ্তরের কাজ!

এর কিছুদিন আগে কবির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল, সংগীতগুরু 'দিনুবাবু'র মাধ্যমে। উপলক্ষ ছিল আমার একখানি কবিতার খাতা। এই বই-এর প্রসঙ্গগুলোর এখান থেকেই শুরু। সুতরাং, ধরে নিতে হবে, এসবের ঘটনাকাল মোটামুটি কবির জীবনের শেষ চৌদ্দ বছর।

একদিন বড়ো কথা ছোটো হয়ে যায়, ছোটো কথারই মূল্য বাড়ে। এমন দিন অবশ্য সকলের সম্পর্কে আসে না; যাঁদের বেলায় আসে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। তাঁর বিষয়ে কোন্ কথা যে তুচ্ছ, তা আজই বসে স্থির করা কঠিন। এসব ক্ষেত্রে বিচারের ভার মানুষের হাতে না রেখে কালের হাতেই বোধ হয় ছেড়ে দেওয়া ভালো।

যাঁরা কবিকে চাক্ষুষ দেখেননি, কবির ঘরোয়া জীবনের নিতান্ত ছোটোখাটো কথায় তাঁদের ঔৎসুক্যের শেষ নেই; এ খুবই দেখা যায়। আজকেই এ অবস্থা, নিরবধি ভাবীকাল তো পড়েই আছে। সেরূপ কিছু শুনতে বা পড়তে পেলে কবিকে তাঁরা সশরীরে কাছে পাওয়ার সামিল মনে করেন কাছাকাছি থাকায়, কবির জীবনের শেষ একটি

যুগকে কিছুটা জীবন্ত অনুভব করেছি। যেটুকু জানি, ভুলত্রুটির দ্বিধা পেরিয়ে বিশেষ করে তাঁদের জন্যই কিছু বলে রাখার আরো ইচ্ছা হয়।

তবে, এ কথালাপ পরের জন্যও সব নয়, পর উপলক্ষ মাত্র। প্রকারান্তরে এ হচ্ছে কবির সঙ্গসুধার পুনরাস্বাদন। অনেক সময় খাবার আনন্দ জমে দিয়ে-খাবার আনন্দে। পরকে শুনিয়ে এ একরকম লেখকের নিজেরই উপভোগ জমানো।

যাঁর কৌতূহল, এবং ক্রমাগত উৎসাহ থেকে এই কথা-সংগ্রহের উৎপত্তি, তাঁর কথা আজ সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তিনি শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বর্তমানে বিশ্বভারতীর পুঁথিশালা বিভাগের অধ্যক্ষ। এই বইর রচনাতে আমার বোন শ্রীমতী সাধনা করেরও বিশেষ যোগ রয়েছে। প্রকাশের পূর্বে সুহৃদ্বর শ্রীমোহনলাল মিত্র, শ্রীপরমেশ বসু প্রভৃতি হিতৈষীদের সাহায্য ভুলবার নয়।

গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। মাননীয় সম্পাদকবর্গ এজন্য ধন্যবাদার্হ। বিশ্ব-ভারতীর ঋণ সর্বশেষে বিশেষভাবেই স্মরণ করি।

২২শে শ্রাবণ বইটি বেরবে কথা ছিল। নানাবিধ অসুবিধার দরুণ প্রকাশে বিলম্ব হল।

শান্তিনিকেতন

৭ই পৌষ, ১৩৫৮

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সূচীপত্র

কবি ও শান্তিনিকেতন

লাল কাঁকরের উঁচুনিচু বিশাল শুকনো ডাঙা। তারই মধ্যে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র বর্ণের আকস্মিক সমারোহ। সীমানায় পা বাড়াতেই বাতাসের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শ ; ঐন্দ্রজালিক মায়ায় মাঠঘাট নেয় প্রাণ টেনে। স্থানের নাম-মাহাত্ম্যের প্রথম ইঙ্গিত দেয় শান্ত শ্যামল প্রকৃতি। গাছ-গুল্ম, তৃণলতা, ওষধি-বনস্পতি, এরা ফুলে-ফলে পাতায়-তৃণে ভরিয়ে রেখেছে আনাচ-কানাচ। আমবাগান, শালবীথি, ছাতিমতলা, মাধবীকুঞ্জ, পঞ্চবটী, নন্দন-অঙ্গন—সব-কিছু এক কবি-মানুষের উষ্ণ অনুরাগে মাখা। এদের ছায়ায়, একরকম এদের হাত ধরে ধরে তাঁর সকাল-সন্ধ্যার চলাফেরা। পাতার কাঁপন, লতার দোলা, পাখির গান, কাঠবিড়ালির খেলা, কাক-শালিখের কোলাহল মানুষটির দেহে-মনে ভরা। তাদের বেদনায় মাখা তাঁর গানের ডালা। উৎসব তাঁর গাছপালা নিয়ে, তৃণলতারা তাঁর অভিনয়ের মূক অভিনেতা। গাছের তলায় শুরু মানুষের জীবনদীক্ষা।—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন।

গাছগাছড়াদের নাম দিয়েছেন কবি নিজে। 'নীলমণি-লতা' ও 'মধু-মঞ্জরী'র কথা আছে তাঁর কাব্যে। আরো নাম দিয়েছিলেন। একটি তাঁর 'রক্তমুখী'। বর্ণে রক্তিম, কিন্তু গন্ধে রিক্তা ; কাঁটাশূন্য মাদারগাছের মতো গাছগুলি, খুদে-খুদে কল্কির আকারে ফুল, গুচ্ছ বেঁধে ঝুলে থাকে,—মন্দিরের কাছাকাছি সদর রাস্তার

দুধারে দেখতে পাওয়া যায়। আরেকটি আছে 'বনপুলক', দ্বারিক-প্রাঙ্গণের উত্তর সীমায়। মিষ্টি গন্ধে মনের তো পুলক ধরায়ই, কিন্তু দূর থেকে যখন দেখা যায় আমলকী-বনফাঁকে তাদের শুভ্র অরুণ দীপ্তি, বোঝা যায় কবির নামকরণের তাৎপর্য। আরো একটি ফুল 'বনজুঁই'। উত্তরায়ণের ফটকের বাঁ-ধারে সে আছে তার চিক্কণ দেহটি বাঁকিয়ে। দেখতে করমচা গাছের মতো, ফুলগুলিও তেমনি, যেন সাদা সাদা তারা—নম্রমধুর গন্ধ-আবেদনে দেখার আগেই সে প্রাণস্পর্শী। এমনি প্রকৃতির ছায়ায় শান্তিনিকেতনে মানুষের মেলা।

পশুপাখিদেরও পিপাসা নিবারণের জন্যে আশ্রমে জলপানের আধার তৈরী হয়েছে। গাছপালার পরিচর্যায় আগে ছিলেন অধ্যাপক জগদানন্দ রায়। এখন আছেন অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেন,—কবির সংশোধনে তিনি হয়েছিলেন 'তেজশ্চন্দ্র'। পথের ধারে তেজেশবাবুর কুটীর, নাম তালধ্বজ। মন্দিরের উপাসনা সেরে কবি বসতেন এসে তার বারান্দায় বেতের মোড়াতে। ঘরের নামটি কবিরই দেওয়া। মাঝে একটি তালগাছ; খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়াল দিয়ে চিরকুমার এই তরুবিলাসীর একলা আবাস রচিত। কুটীর ও কুটীরবাসীকে নিয়েই লেখা 'বনবাণী' কাব্যের 'কুটীরবাসী' কবিতাটি। কবির বুধবারের বিশ্রামস্মৃতি জাগিয়ে কুটীরটি আজো খাড়া আছে।

চিরদিন আশ্রমে ছাত্রছাত্রী ও অধিবাসিগণ সকলেই গেয়ে এসেছে,—'আমাদের শান্তিনিকেতন, সব হতে আপন',—কিন্তু গুরুদেব আর শান্তিনিকেতন যে একেবারে অবিচ্ছেদ্যরূপে

আপনার হয়ে ছিলেন, এ-কথা গুরুদেব বেঁচে থাকতে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়নি। ফুলের ভিতর সুবাসের মতো আশ্রমে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে ছিলেন।

কোনো অনুষ্ঠান শুরু হবে, আশ্রমবাসিগণ সমবেত হয়েছে, দেশ-বিদেশাগত নরনারীর ভিড়। ফুলে, আলপনায়, সাজ-সজ্জায় সুরচিত হয়েছে পটভূমি, ধীরে ধীরে থামল এসে মোটর। দেখা গেল সেই শুভ্র জ্যোতির্ময় মুখ, পূর্ণ হল শূন্য আসন। চিত্রে পড়ল শেষ টান। সবার মন ভরে উঠল।

মন্দিরের উপাসনার আহ্বান নিয়ে উপস্থিত হত ছাত্রছাত্রী-গণ। কারুকার্যখচিত কাঁচের মন্দিরের সামনে সুন্দর আলপনা। সকালের অরুণরশ্মি এসে পড়ত মন্দিরে, মেজেতে ; তারই মধ্যে ভাস্বর হয়ে উঠত কবির সৌম্য শান্ত রূপ। সন্ধ্যায় নৈঃশব্দ্য-পারাবার, নিবিড় অন্ধকার, মন্দিরের চারপাশে সাজানো প্রদীপ-মালা, তারই মাঝে স্বল্পালোকে সবার চোখে প্রদীপ্ত হত সেই রূপ। এমনি কত ছবি চোখের সামনে ভাসমান রয়েছে।

আশ্রমবাসীদের মধ্যে প্রাচীন যাঁরা, তাঁদের জীবনে গুরুদেবের সঙ্গ, তাঁর সাহচর্যের স্মৃতি পরমবিত্ত। গুরুদেব-প্রয়াণের আট দশ বছর আগেকার ছাত্রছাত্রী, অধিবাসী যাঁরা, তাঁরাও কম লাভবান নন। মৃত্যুর ক-বছর আগেও তিনি এক-একদিন সন্ধ্যার পরে গল্প কবিতা পড়ে শোনাতেন সবাইকে। ব্রাউনিংয়ের কবিতা পড়ে আলোচনা করেছেন,—যেন এ সবেমাত্র সেদিনকার কথা।

কিন্তু পড়ার সঙ্গে আর একটি দৃশ্য তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মনে

চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। খালি চোখে শেষ অবধিই তিনি বই পড়ে এসেছেন, পড়া শেষে চশমাটি তুলে চোখে দিতেন, সবার দিকে চোখ মেলে চাইতেন,—স্নিগ্ধ মধুর সে-হাসি, প্রীতি মাখা সে-চাহনি। সমভাবে অবিস্মরণীয় তাঁর পাঠ, লেখা আর চাহনি। রূপ ও বাণীর এমন সুসংগত মিলন, ঠিক তাঁর গানের কথা ও সুরের মতো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স যখন প্রথম প্রবর্তিত হল, আশ্রমের শিক্ষাভবনে গুরুদেব স্বয়ং তার ক্লাস নিলেন কিছুদিন। স্কুলকলেজের সাহিত্য-সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করতেন। আগ্রহ নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল চোখে বসে বসে ছেলে মানুষের মতো শুনতেন। একবার স্কুলের সভায় বলেছিলেন,—তোমরা নানা বিষয়ে লিখে এনেছ, আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি চাই তোমরা অল্প বয়েস থেকে নিজেদের সাধনার ক্ষেত্র জেনে নাও, সেই পথে অগ্রসর হও, ভবিষ্যৎ পথ তোমাদের সুগম হোক।

তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ছোটোকাল থেকে বেড়ে উঠবে অনাড়ম্বর জীবনে, নিজের হাতে সমস্ত কাজ করতে শিখবে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টিয়ানে কোনো তফাৎ রাখবে না, এ-কথা তাঁর লেখায়, কাজে এবং কথায় চিরকাল জেনে আসছে সবাই।

বিশ্বকবি তিনি, বিশ্বের সব দেশে সমাদৃত; তবু তিনি একান্তভাবে আশ্রমের গুরুদেব। আশ্রম থেকে তিনি তফাতে থাকতে পারতেন না, থাকতে চাইতেনও না। বাইরের সমস্ত কাজ, সমস্ত বক্তৃতা, ঘোরাফেরার মধ্যে শান্তিনিকেতন

তাঁর মনে লেগে থাকত, ব্যাকুল হয়ে থাকতেন এখানে আসবার জন্যে।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তাঁকে প্রত্যেক বুধবার প্রণাম দিতে যেত ফুল নিয়ে। গুরুদেব হেসে কারু পিঠ চাপড়ে দিতেন, কারুর বা মাথায় দিতেন হাত বুলিয়ে, তারপরে সবার হাতে দিতেন টফি, চকলেট, লজেন্‌স্‌। জানতেন এর উপরেই ছোটোদের যত লোভ।

সবাই একত্রে তাঁর কাছে বসে খায়, এ-দৃশ্য দেখতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। শিক্ষক ও আশ্রম-কর্মিগণকে মাঝে মাঝে উত্তরায়ণে চায়ের নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। প্রয়াণের বছর যখন জন্মদিনে অত্যন্ত অসুস্থ, চলাফেরা করতে অশক্ত, তখনো নিজের চোখে সকলের খাওয়া দেখবার সাধ কত! উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে খাবার জায়গা করিয়ে সকলকে খাওয়ালেন।

আশ্রমের প্রত্যেকের জন্যে তাঁর দরদ ছিল। কারুর অসুখ হয়েছে শুনলে নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতেন। বোর্ডিং-এ একবার লীলা নামে ছোটো একটি অবাঙালী মেয়ের অসুখ হয়েছিল। কঠিন টাইফয়েড। ডাক্তার আর শুশ্রূষাকারিগণ ভিন্ন কারো যাওয়া নিষেধ। গুরুদেব এসে দেখে যেতেন। কোনোদিন আনতেন ফুলের তোড়া, কোনোদিন বা মজার কোনো খেলনা। কাছে বসে কত ডাকাতের গল্প, হাসির গল্প বলতেন। রোগ-যন্ত্রণা ভুলে যেত মেয়েটি।

সব দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাঁরই মুখে তাঁর ছাত্রীরা একদিন শুনেছে সংসার গড়বার কঠোর নিয়ম। এখানকার

মেয়ে-বোর্ডিং-এর নাম শ্রীভবন। একবার সমস্ত মেয়েকে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন,—তোমাদের বাসস্থানের আমি নাম দিয়েছি শ্রীভবন। শ্রী মানে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী শুধু ধনেরই প্রতীক নন, তার চেয়েও বড়ো তিনি, শ্রী-রূপিণী। মেয়েরা লক্ষ্মী, কারণ শ্রী-তে তাদের জন্মগত অধিকার। ধনৈশ্বর্য না থাকুক, যে-সংসারে শ্রী আছে লক্ষ্মী সেখানেই বিরাজমানা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তো চিরদিন সেই সংসারই খুঁজে বেড়ায়। তোমরা যেখানে থাকবে, যে-কাজ করবে, শ্রী যেন তাতে মূর্ত হয়ে ওঠে। তারই জন্যে তোমাদের থাকবার জায়গার নাম শ্রীভবন। বিলাসিতায় নয়, শ্রী-তে মণ্ডিত হোয়ো তোমরা।



—'এই চোর'!—ডাক শুনে দুটি মেয়ে চমকে উঠল। একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি হাতের ফুলটা ফেলে দিল মাটিতে। দেখল কোনার্কের জানালায় স্বয়ং গুরুদেব দাঁড়িয়ে।

অনেক দিনের কথা। শ্রীভবনের ছোটো দুটি মেয়ে একদিন দুপুরে ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল—সাহিত্য-সভা হবে, সাজাবে। বসন্ত ঋতু। বাগানে তখন নানারঙা দিশি-বিলিতি ফুলের দরবার। উত্তরায়ণে ঢোকবার রাস্তায় অজস্র রঙ্গন, টগর আর গন্ধরাজ। গিয়েছিল তারা তারই লোভে। গুরুদেবের তখনকার বাড়ি কোনার্ক; তার সামনেটা দেখে আর তারা চোখ ফেরাতে পারে না। এই বড়ো বড়ো রং-বেরংয়ের গোলাপ

ফুলের মেলা। দু-একটাও যদি পাওয়া যায়, কী চমৎকারই না হবে সভা সাজানো। দুজনে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে,—কার কাছেই বা চায়;—পা বাড়াল। একটি ছিল ডানপিটে—সে কোঁচড়ের ফুলগুলি ঢেলে দিল অন্যটিকে, আগুপিছু আর না চেয়েই ছুটে গিয়ে ঢুকল গোলাপ-বাগিচায়। একটা ফুল ছিঁড়ে যেই ছিঁড়বে আরেকটা—অমনি ডাক পড়ল —'এই চোর!'—গুরুদেবের গলা। পাড়াগাঁর মেয়ে, মাত্র বছর-খানেক এসেছে শান্তিনিকেতনে। গুরুদেবের ঠিক পরিচয়টি বুঝতে না পেরে কল্পনা করত অনেক কিছু। আশ্রমে তাঁকে সবাই চলে সমীহ করে। বাড়ি গেলেও সবার প্রশ্ন শুনতে হয় —শান্তিনিকেতনে থাকিস,—দেখেছিস রবি ঠাকুরকে? সবার সঙ্গে কথা বলেন তিনি?

মেয়েটি কত কী যে ভাবত এ সব মিলিয়ে!

যাক্,—দুজনে বাগানের বাইরে এসে তো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, গুরুদেব ডাকলেন—শুনে যা।

পা আর ওঠে না। বুকের মধ্যে দুরু দুরু। গুরুদেবের ডাক—অমান্য করা যায় না, দুটিতে মিলে দাঁড়াল গিয়ে সামনে। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—চুরির কী শাস্তি জানো? ভয়ে উত্তর জোগাল না, ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে দুটিতে তাকিয়ে রইল। টেবিলের সামনে জানালা। একটা পাট বন্ধ, তিনি লিখছিলেন। বাইরে থেকে তাঁর উপস্থিতি জানা যায় নি। মেয়েদুটির মুখের চেহারা দেখে গুরুদেব হেসে ফেললেন, বললেন,—বোকা মেয়ে সব, হাত দিয়ে গোলাপ ছেঁড়ে বুঝি? মালীকে বল্,

নয়তো দেখ ওখানে আছে ফুল কাটবার কাঁচিটা, নিয়ে কেটে নে। আজ তোদের সাহিত্য-সভা বুঝি ?

অনেক কথা বললেন হেসে হেসে। চলে আসবার সময় বলে দিলেন—না বলে কিছু নিতে আছে কি ? চাইলেই তো পেতিস।

তারা এরকমটি আশাই করেনি। ভীষণ একটা কিছু ভেবে রেখেছিল—সেদিন সারাদিন ধরে শুধু মনে হয়েছে—এ-যে সাধারণ মানুষ। কেন তাঁকে এত ভয় করে লোকে ? ঠিক বাড়ির ঠাকুর্দার মতো। সবাই তাঁর ভয়ে তটস্থ, কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না ছোটোরা। তবু কত সময় তিনি ডেকে আদর করেন, খুব রাগেন, আবার হেসেও ওঠেন। এ-যে ঠিক তাই। সেদিন বিস্ময়ে ভরল শিশু-মন।

কবির মধ্যে কিন্তু কোনো গরিমা গাম্ভীর্য ছিল না ছোটোদের কাছে। ছোটো ছেলেদের তিনি জানতেন আনন্দের উৎস বলে। তারা কাছে গেলে ঠিক তাদেরই মতো করতেন ব্যবহার।

ছোটো ছোটো ছেলেরা আবার মাঝে মাঝে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে যেতো। তিনি আনন্দেই দিতেন নাম লিখে ; তার পরেই হৈ হৈ করে ডাকতেন—ওরে আলু, নে নে, আদায় করে নে টাকা। অমনি অমনি অটোগ্রাফ লিখে নিচ্ছে যে ! ছেলের দল তো মহা খুশীতে ঘরের বার হয়েই দে ছুট। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে তাদের গায়ে জ্বর আসত না, দ্বিধা সঙ্কোচ বা গাম্ভীর্য লেগে থাকত না মনে। তারা বরঞ্চ খুশী

হয়ে তাদের নিজেদের হাতে-লেখা পত্রিকা থেকে বাছাই করা লেখা এবং ছবি দিয়ে সাজিয়ে সুন্দর একটা বই বাঁধিয়ে নিল,—আর সেটিই কবিকে তাঁর জীবিতকালের শেষ জন্মদিনে দিল উপহার। নামটি দিয়েছিল 'আমাদের বই'। বিশ্বকবি সে-বই পেয়ে কী খুশী! ছোটোদের সাধারণ আবোল-তাবোল বলে তার কিছুমাত্র কম মর্যাদা দেননি। অন্যান্য বড়ো বড়ো বইর মতোই খুলে পড়েছেন সে-বই।

একদিক থেকে বড়োদের চেয়েও তিনি ছিলেন শিশুদের বেশি আপন! ছোটোদের শাস্তির কথা মনে করতেই পারতেন না। বলতেন—ওরা যে দোষ করবে সে তো ওদের ধর্ম। ছোটোর দল যতই ভয় পাক, তিনি কিন্তু সব সময়েই তাদের জন্য আনন্দিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালের কঠিন অসুখের পরে যখন নীরোগ হয়ে উঠলেন, দেশ বিদেশ থেকে নামজাদা কত লোকের চিঠি এল, টেলিগ্রাম এল, ফোন এল। তারি মধ্যে হাজারিবাগ থেকে এলো একখানা চিঠি, দুটি ছোটো ছেলেমেয়ের লেখা। অত বড়ো কবির কাছে তাদের মনের আনন্দ জানাতে সাহস করল। উত্তর পাবার (তাও কবির নিজের হাতের লেখা) কল্পনা তারা নিশ্চয়ই করেনি। কবির মন কিন্তু ঐ ছোট্ট একটু চিঠির আনন্দেই উঠল নাড়া খেয়ে। সবার আগে সে-চিঠির উত্তর দিয়ে তিনি তাদের স্নেহের দাবির সম্মান রাখলেন। শুধু তাদের নয়, বলা যেতে পারে, শিশুমাত্রেরই ভালোবাসা, স্নেহ ও আনন্দের সরল অভিনন্দনকে নিলেন স্বীকার করে।

আশ্রমে অনেক উৎসব আয়োজন হত, বড়ো বড়ো প্রদর্শনীরও অভাব ছিল না, তাদের উপর রবীন্দ্রনাথের নজর ছিল। কিন্তু আশ্রমের ছোটো ছেলেরা 'মুকুট-ঘর'-এ তাদের তৈরী জিনিস দিয়ে ছবি ও খেলনার যে প্রদর্শনী করত তিনি তাও দেখতে আসতেন খুশী হয়ে। তাঁর মুখের উজ্জ্বল হাসিটিই জানিয়ে দিত এর উপর তাঁর কত দরদ!

ব্যক্তিগত পরিবেশ ও অভ্যাস

ব্রাহ্মধর্ম, উপনিষদ-সংগ্রহ, ডাক্তারি-বই, চিঠির প্যাড, গোটাকয়েক ফাউন্টেনপেন, দু-চার খানা অটোগ্রাফের খাতা, ছবি-আঁকার রং-এর শিশি, তুলির গোছা—লেখবার টেবিলের এই ছিল স্থায়ী উপকরণ। লেখা ছিল কবির নিয়মিত কাজ। অবসরে পড়া, নয় ছবি আঁকা, নয় স্বর বসিয়ে গান শেখানো, অভিনয়ের মহড়া, দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা—এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এর উপরে আশ্রমের কাজকর্মের ভিড় ও নানা বৈঠক তো লেগেই ছিল। মাঝে একবার নিজে সব দেখবেন-শুনবেন বলে আশ্রমের প্রত্যেক বিভাগ থেকে বিভাগীয় অধ্যক্ষ-প্রেরিত দৈনিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতেন এবং তা পড়ে তাতে মন্তব্য লিখে সই করে দপ্তরে দপ্তরে পাঠাতেন। এর মেহন্নত কম ছিল না। ঝকমারি সবটাই তাঁর কাছে কর্তব্যজ্ঞানে সুসহ হয়ে উঠেছিল।

কবির ঘরের লোক বলতে ছিল দুজন পরিচারক, উড়িয়া বৃদ্ধ বনমালী এবং বিহারী যুবক মহাদেব। আর ছিল পোষা জীব—একটি বেঁজি, একটি লাল কুকুর, কবি নাম দিয়েছিলেন 'লালু'। ঘর নিকোবার জন্যে 'বালি' নামে সাঁওতাল মেয়েটি আসত রোজ গাঁ থেকে। এরা সকলেই কবির সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। গাঙ্গুলি মশায় (শ্রীপ্রমোদ গাঙ্গুলি) ও আলুবাবু (শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়) ছিলেন কিছুদিন কবির ব্যক্তিগত সুখসুবিধা

তদারকের কাজে। আর দিন রাত্রি না হলেও একরকম সারা-দিনেরই অফিসের কাজে নিত্য-অনুচর ছিলেন শ্রীসুধীন্দ্র ঘোষ।

খোস-মেজাজের গল্পগুজবে প্রফুল্ল আবহাওয়ায় থাকাই ছিল কবির ভিতরের মানুষটির স্বভাব। এদিক দিয়ে গৃহমণ্ডলীতে অনিলবাবু (শ্রীঅনিল কুমার চন্দ) ও সুধাকান্তবাবু (শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী) জুটে ছিলেন খুব কাজের লোক। অফিসের হাজার গুরুতর কাজের মধ্যেও ফাঁকে ফাঁকে সুযোগমতো হাস্য-পরিহাসের সুনিপুণ প্রয়োগে রবির অস্ত-পরিবেশকে উজ্জ্বল রাখতেন অনিলবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌বৈদগ্ধ্যে।

সুধাকান্তবাবুর কাছে কারুরই মন গুমরে থাকার উপায় ছিল না। কবিকে মাতিয়ে রাখতেন অনেকটা তিনি এ-দেশের রীতিনীতি, সমাজ, ধর্ম ও লোকচরিত্রের বিচিত্র সরস আলোচনায়। এক্ কথায় জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—কবির সব কাজের লোক ছিলেন তিনি; রান্নার ফোঁড়নও যেমন উঠেছে তাঁর হাতে, তেমনি কবির নিগূঢ় কাব্য ব্যাখ্যার কলমও চলেছে সমান তালেই। আবার, কবির প্রতিনিধি হয়ে সারা ভারতে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহেও তাঁকে ঘুরতে হয়েছে সময় বিশেষে। এঁদের আগের পর্বে ছিলেন অমিয়বাবু। তাঁর সমঝদারিতা কবিকে সাহায্য করেছে অপেক্ষাকৃত গুরুবিষয়ে—যেখানে রবীন্দ্রনাথ মনীষী ও বিশ্বকবি।

কবি রেগেও যেতেন মাঝে মাঝে। তাঁর রাগের আস্বাদ পাওয়া যায়, এমন একখানি পত্র এখানে দেওয়া গেল।

লেখককে একখানি ছোটো কার্ডে লিখছেন,—

কল্যাণীয়েষু,

গীতবিতানের কোন অশুভগ্রহ তুমি? শুরু থেকেই তোমার করক্ষেপে সে মুহ্যমান—তোমার প্রভাবের মেয়াদ এখনো কি কাটবে না? এক বছর তো গেল।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটোখাটো অভিমানও ছিল। গুরুদেব বেঁচে থাকতে তাঁর শেষ জন্মদিন। আশ্রম থেকে অনুষ্ঠান উপলক্ষে পয়লা বৈশাখে ছাপা হল তাঁর নতুন বই—'গল্পসল্প'। গুরুদেব অসুস্থ, প্রুফ দেখে দিতে পারলেন না। এইটিই প্রথম বই, যা তাঁর হাতের সংশোধন ব্যতীত ছাপানো। নয়তো প্রত্যেকটি বইয়ের একাধিক প্রুফ শত ব্যাঘাতেও তিনি নিজ হাতে দেখে দিয়েছেন। বইটি ছাপানো হচ্ছে গল্প ও কবিতার ক্রম-পর্যায়ে। এক কপি নিয়ে দেওয়া হল গুরুদেবের হাতে। আগাগোড়া পড়লেন। কোথাও তেমন ভুল নেই। শুধু একটা কবিতার একটি লাইনে ছন্দের একটু গোলমাল। দেখেই তিনি বলে উঠলেন,—এ হতেই পারে না, ছন্দের ভুল রয়েছে। শিগগির পাল্টাও। সমস্ত বইটার ছাপা শেষ হয়ে গেছে। এখন পাল্টানো! আগে যে-শব্দটা দেওয়া হয়েছিল তাতে ছন্দ ঠিক ছিল। অর্থ ঠিক ছিল না। তাঁকে সে কথা বলা হল। তিনি মুখে মুখে বাতলে দিলেন আরেকটা শব্দ। মাত্রা গেল একটু বেড়ে। তখন তাঁর এমন অবস্থা,—বার বার বিরক্ত করা যায় না। পরের শব্দটিই নেওয়া হল। সবাই ধরে নিলেন ওটুকু

ব্যতিক্রম, তেমন কিছু হবে না। কিন্তু গুরুদেবের কী অভিমান! শুধু বলেন,—আমি বলছি মাত্রা ভুল, আর তোমরা বলছ, ঠিক আছে?

ব্যাপারটা লঘু করে নেওয়ার জন্যে বলা হল,—কী আর হবে; ও চলে যাবে।—রেগে উঠলেন। বললেন,—চিরজীবন ছন্দ লিখে আমি ছন্দ জানিনে? লোকে বলবে, বুড়ো বয়সে মাথার ঠিক নেই। ছন্দ রাখতে পারেনি। তোমাদের জন্য শেষটা এই অপবাদ নিতে হবে?

কোনো কথাই চলল না। সে-পাতাটা ছাপাতেই হল পাল্টে; তবে শান্ত হলেন। মনে পড়ে তাঁর সেদিনের সেই রেগে-রেগে ওঠা—আমাকে শেখাবে তোমরা? সে-ধৃষ্টতা যে চিন্তারও বাইরে, তখন কে বোঝাবে তা! সেদিন তাঁর সেই অবুঝ অভিমানই সকলের উপভোগ্য হয়েছিল। ছন্দ শেখাবে তাঁকে!

সময় বিশেষে তোপের মুখে অন্য কেউ যখন বড়ো বেশি সুবিধে করে উঠতে পারছেন না, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গিয়ে উপস্থিত হতেন। পিতার উপর পুত্রের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তারের দৃশ্যটি নেপথ্যে আমাদের অনেক সময় সরস রহস্যে উপভোগ্য হত। কিছুই যেন ঘটেনি, এমনি স্বাভাবিক হয়ে সমস্যাটা সুস্থির আলোচনার মুখে এসে যেত।

যেটা একটু অসুবিধার দাবি, কবির সেটা পেশ করবার স্থান ছিল তাঁর বৌমার (শ্রীমতী প্রতিমা দেবী) কাছে। খাবার সময় কাছে থাকতেন বৌমা, প্রাত্যহিক দেখাশুনাও করতেন

তিনি। সে-সময় ছোটোছেলের মতো ভাবটি ছিল কবির আদরে-আবদারে।

আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় সুরেন কর মশায় ছিলেন কবির দক্ষিণ হস্ত। কবির দিনযাত্রার খুঁটিনাটি ব্যবস্থার ভারও অনেকখানি বর্তাত তাঁর উপরে।

কবির বেশভূষার বিশেষত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদিকে নিজের রুচিকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। একটি ঢিলে পাঞ্জাবী এবং দোসূতী মোটা লুঙী বা পাজামা—এই ছিল তাঁর সাধারণ পরিধেয়। সে-সব খুব বাছাই-করা সূক্ষ্ম বা দামী কিছু নয়, সাদাসিদে মাঝারি গোছের ছিল। অনেক সময় দুটা পাঞ্জাবী একত্রে পরতেন ; ভিতরের দিকেরটা থাকত ঘাম শুষতে। বাড়ীতে পরবার কাপড়-চোপড় খদ্দরেরই ছিল বেশি। অথচ চরকা ও খদ্দর নিয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল না, তা সকলেই জানেন। লোকের থাকে 'মীটিংকা কাপড়া' খদ্দরের, ওঁর কিন্তু ছিল উল্টো। বেশভূষায় রঙের বৈচিত্র্য ছিল তাঁর পছন্দ। হয় গেরুয়া, না হয় সাদা—এ দু-রঙের কাপড় ছিল আটপৌরে। মন্দিরের উপাসনা বা কোনো সভাসমিতিতে প্রকাশ্যে বেরতে নিতেন সাদা ধুতি ও জামা-চাদর ;—না হয়, তাঁর দরবারী পোষাক ছিল আলখাল্লা। ছিল তা নানা রঙেরই। সাজে রঙের বাহার লাগত ঋতু-উৎসবগুলিতে। বর্ষায় কালো বা লাল, শরতে সোনালি, বসন্তে বাসন্তী রং-এ চোখ ঝলসাত তাঁর রেশমী উত্তরীয়।

শেষদিকে একবার দোলের আসরে ভুলে পরে চলে গেছেন

কালো আলখাল্লা। চাকররা যা হাতে দিয়েছে, তাই পরে ফেলেছেন, তাড়াতাড়িতে অত খেয়াল করেননি। উৎসবে গিয়ে কিন্তু রঙের রুচি নিয়ে মেয়েদের হাসিঠাট্টার মুখে পড়লেন। পিছু হঠবার পাত্র কি তিনি? জবাব দিলেন কবিতায়। প্রকাশ্যে সেদিনই মাত্র কবিতা থেকে জানা গেল ব্যাপারটা। 'নবজাতক' কাব্যে 'জবাবদিহি' নামে সেই কবিতাটি স্থান পেয়েছে। প্রথমে প্রবাসীতে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। তারও আবার একটি গল্প আছে। শ্রীপুলিন সেন তখন প্রবাসীর সহকারী-সম্পাদক। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য-পারঙ্গম বলে কবির কাছে তাঁর পরিচয় ও যাতায়াত ছিল। আশ্রমের উৎসবে এসে প্রবাসীর জন্য কবির রচনা সংগ্রহে গিয়েছিলেন তিনি উত্তরায়ণে। কবি 'কিছু নেই' বলে প্রথমটা তো দিলেন তাঁকে হাঁকিয়ে। তারপরে কিন্তু সেই পুলিনবাবুই সেবার পেয়ে গেলেন গদ্য-পদ্যে ছোটোবড়ো কবির হাতের প্রায় ত্রিশটি রচনা—এক সংখ্যার জন্যেই। দোলের ঐ কবিতাটি অর্থাৎ 'জবাবদিহি'ও সেই সঙ্গেই ছিল। কিসের 'জবাবদিহি' ব্যাপারটা লোকের বুঝবার জন্য কবি তখন-তখনই একটি ছোট্ট ভূমিকাংশও কবিতাটির আগে যোগ করে দিলেন। কবির এত অধিক সংখ্যক রচনা কোনো পত্রিকার এক সংখ্যায় কখনো বেরয়নি বলেই ঘটনাটিতে একটু বিশেষত্ব আছে।

খাওয়াদাওয়ায় কবির নিরামিষে ছিল ঝোঁক। আমিষও তিনি গ্রহণ করতেন। ডাক্তারি-ব্যবস্থাকে মানতেন আগে। মাংস ও ভাতের মিশোলে-তৈরী জাউয়ের মতো খাদ্য শেষদিকে

কিছুদিন ছিল তাঁর জন্য চিকিৎসকদের কড়া ব্যবস্থা। ভালো-বাসতেন মিষ্টান্ন। নানা প্রচুর ফলের সমাবেশ থাকত চায়ের সঙ্গে। তার মধ্যে পেপে খেতেন নিয়মিত। তাঁর মধ্যাহ্ন-আহারে ভাত ও সন্ধ্যার আহারে ছিল লুচি বরাদ্দ।

বেলা দশটায় সাধারণত লেখার টেবিল ছেড়ে যেতেন স্নানে, সাড়ে এগারোটা-বারোটার মধ্যে আহার শেষ হত। শ্বেত-পাথরের দশ-বারোটি ছোটো ছোটো বাটিতে ও থালায় ভাত ও নানারকম ভাজাভুজি, ছোঁকা, ডাল, তরকারি, ঝোল ইত্যাদি থাকত সাজানো। দু-এক চামচ করে এ-বাটি ও-বাটি থেকে একটু-একটু তুলে নিয়ে গল্প করতে করতে খেতেন। সবশেষে একটু দই ও পায়েস নিতেন। আশ্রমের নানা বাসা থেকেও মাঝে মাঝে খাবার তৈরী হয়ে আসত। সে-সব জিনিসও সানন্দে তিনি গ্রহণ করতেন।

আহার কমে গেলে রান্নার বৈচিত্র্য দ্বারা রুচি বাড়াবার জন্য যখন নানা চেষ্টা চলছে, সে-সময় একদিন তাঁর এক কর্মীর বাসায় গেল উত্তরায়ণ থেকে রান্নার ফরমাশ। সঙ্গে গেল কিছু-কিছু উপকরণও। যত্ন করে সব জিনিস তৈরী করা হল। কবি সে-দিন যখন দেখলেন দুপ্রস্থ আয়োজন এবং একটি তার কর্মীর বাসার, বাড়ির খাবার ঠেলে রেখে অন্য জিনিসগুলি টেনে নিয়ে বললেন, আজ এ-সবই খাব, ও-সব থাক্। খেলেনও তাই। রাজভোগের কাছে সাধারণ গেরস্থ-ঘরের ডাল-তরকারির সামান্য আয়োজন! প্রস্তুতকারিণী প্রৌঢ়া মহিলাটি দাঁড়িয়েছিলেন কাছেই অপ্রস্তুত মনে। মুখের দীপ্তিতে

দেখাল যেন তাঁর আজীবনের রান্না সার্থকতা পেল কবির মুখের দুটি কথায়। কবি খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করছিলেন, আর মহিলাটি জিনিসের পরিচয় ও পাক-প্রণালী বলে বলে সব খাইয়েছিলেন কবিকে।

সে-সময় কবি উল্লেখ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের মাছ-রান্নার প্রসঙ্গে একটি গল্প। শিলাইদহে থাকতে কিছুদিন তিনি নিরামিষ খেতেন খুব নৈষ্ঠিকভাবে। তখন কবিপত্নী পরলোকে। আমিষ ব্যবস্থার সম্বন্ধে কারো কথা কোনো কাজে লাগেনি। কবির শাশুড়ী ঠাকরুন অবশেষে নিজে একদিন মাছের নানা জিনিস রেঁধে তাঁকে খাওয়াতে বসলেন। সেবার তাঁর কাতর অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। পূর্ববঙ্গের রান্নার বৈচিত্র্য ও রসমাধুর্য কবির রসনার আদর পেয়েছিল।

শেষ রোগ-শয্যায় উদয়নের এক তলায় থাকতে কবি গল্প করেছিলেন নিজের রান্নার। এ বিষয়ে তাঁরও অভিজ্ঞতা কম নেই, এই দাবিই জানিয়ে রাখছিলেন হাস্যচ্ছলে। গল্প করে করে বলতেন—রসের ভিয়েন কেবল বিশ্বের সাহিত্যেই চড়িয়েছি-তা নয়, অন্দরেও রস জমাতে দক্ষতা কম ছিল না। তবে অসুবিধের বিষয় এইটুকু, যিনি সাক্ষ্য দেবেন তিনি নেপথ্যে। 'ছোটোবউ' প্রাতে রোজ নিয়ে বসতেন তাঁর কুটনার ঝুড়ি। যুক্ত পরিকল্পনা মতো নানা তরকারি যেমন ভাগে ভাগে কাটা হয়ে উঠত মিষ্টিও তৈরী হত নানা রকমের। দুজনের মস্তিষ্ক এবং হাতের সক্রিয়তা ছিল তার পিছনে, সে এক মজাই ছিল।

এখন আর কে-ইবা স্বীকার করবে সে কারুপনা, নোবেল প্রাইজ তো আর মেলেনি সেদিকে !

পত্রিকা থেকে রান্নার ফর্দ ও প্রণালী দেখে নিজ তত্ত্বাবধানে পছন্দমতো নানান তরিতরকারি ও খাবার তৈরী করানো ছিল কবির এক বিনোদন বিশেষ। অন্য আর-সব কাজের দিক সাম্‌লে পার্শ্বচর সুধাকান্ত বাবুকেই এ কাজটি বিশেষ করে দেখতে হত, পূর্ব-অভিজ্ঞতার খ্যাতিতে।

কবি সকালে ছ-টার মধ্যে খেতেন কফি। বেলা ন-টার মধ্যে এক গ্লাস ফলের সরবত, বারোটার মধ্যে ভাত, অপরাহ্ন দু টায় চা এবং সন্ধ্যা ছ-টা থেকে সাতটার মধ্যে ছিল নৈশ-ভোজনের পালা। রাত্রে লেখাপড়ার কাজ থাকত বন্ধ। রাত ন-টায় নিতেন শয্যা।

কবির সকালে কফি-খাওয়ার অভ্যাসের কথা জানা ছিল না, চা খান তাই জানি। একটি ঘটনায় সে অজ্ঞতা ধরা পড়ে, এবং কবিই সে ভ্রম দূর করেন।

কবি রোগশয্যায়। রবীন্দ্রজন্মতিথি উপলক্ষে তখন 'কবিতা'-পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে জানতে পেরে, তাতে পাঠাবার উদ্দেশ্যে আমি একটি কবিতা লিখি। কবির তখনকার দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবচিত্র ছিল লেখাটির বাইরের রূপ। তার মধ্যে একস্থলে, আঠারো-অক্ষরী পয়ার ছন্দের দুটি পঙক্তির একটিতে শেষ শব্দটি ছিল 'চা-পান', অন্যটিতে মিলের শব্দটি ছিল 'জাপান'। কবিতাটি দেখে কবি

হৃষ্টচিত্তে স্বীকৃতি জানালেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তীদের হেসে বললেন, —বাঙাল করেছে কী দেখো। মূলেই গোল বাঁধিয়ে বসে আছে। কবিতার মিলের খাতিরে শেষে আমার ভুল ইতিহাস রটনা! হদিশ না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের দৃষ্টিতে চাইলাম। বললেন, সকালে চা খাই তোমাকে কে বললে? বললাম,—আজ্ঞে, অত বড়ো পেয়ালা-ভরা রোজ সকালে তবে কী দেখি আপনার চায়ের টেবিলে? বললেন,—সে তো কফি।

সেই থেকে আমার দীর্ঘকালের ধারণার সংশোধন হয়। কবিতাটি 'কবিতা'-পত্রে ছাপা হয়েছিল। আমার সাধের মিল 'চা-পান' 'জাপান' গেল উড়ে, শূন্য পঙক্তিদুটি পূর্ণ হল বর্তমান পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঙক্তিতে। তার সংশোধিত রূপটি এই—

সকালের কাঁচা রোদ পড়েছে দুয়ারে এসে লুটে,
নাম না-জানিয়ে কে-যে ফুল রেখে গেছে পত্রপুটে।
পাখিগুলি কিচিমিচি লাগিয়েছে চাতালের 'পর,
ঘরের কুকুর 'লালু' দোরে তোলে ঘেউ ঘেউ স্বর।
দেখা দেন দিদিমণি প্রাতরাশ-পাত্র নিয়ে হাতে,
মূর্ত-সে মায়ের স্নেহ, কুশল-আগ্রহ আঁখিপাতে।
গৃহ-বারান্দায় হল লেখার টেবিলখানি ফেলা,
ডাক এল বাহিরের, চিঠিপত্র এসে গেছে মেলা,
উত্তর অপেক্ষি' তাতে মানুষের বিচিত্র জিজ্ঞাসা,—
রাগে অনুরাগে সে যে মানুষেরই উষ্ণ ভালোবাসা।
বাহিরের বিশ্ব হতে বেদনার সদ্যস্পর্শ লভি'
যেন কী আরোগ্য লয়ে জেগে ওঠে জীবনের কবি।

এই সময়ে কবির 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' নামক কাব্য-দুখানি রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছিল।

মনে লেখার জোগান থাকলে সাধারণত সকালটায় লিখতেনই, দুপুর থেকে পড়তেন। প্রয়োজনমতো সকাল বিকাল দুবেলাই লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ চলত। তবে, সে কাজের বাঁধা-সময় ছিল বিকালে চারটায়। খবরের কাগজ আসত বেলা বারোটায়। খাওয়াদাওয়ার পরে তাই নিয়ে বসতেন গিয়ে আরাম-কেদারায়। ঘুমুতেন না; মিনিট পাঁচেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজ রেখে দিতেন পড়া শেষ করে। এমনি করেই অনেক বইও তাঁর দেখা হত। বলতেন,—মনে কোরো না পড়িনি! পড়ার কৌশল বলতেন,—মোটামুটি শুরুতে, মাঝে ও শেষে বলবার মূল কথাগুলি লক্ষ্য করে গেলে বিস্তারিতটা অধিকাংশস্থলেই খুঁটিয়ে দেখার আর দরকার হয় না। গোটা বইটাতে মন টানতে পারে অল্প রচনাই। বিবেকানন্দের বই-পড়ার গল্প কবি শুনেছিলেন, সেও নাকি ঐ একই কৌশল-প্রয়োগের ব্যাপার। বলতেন,—পড়তে-পড়তে ওটা আপনি এসে যায়। খুব একটা বিশেষত্ব নেই এতে, বেশিদিন পড়ার পর ওরকম সকলেরই হতে পারে। আর বলতেন,—কাগজের সবটা পড়ার দরকারই বা কী। খবর চাই, সেটাই পড়ি। নিজের পয়সা, সময় এবং মনের শান্তি খরচ করে পরের ঝগড়াঝাঁটি পড়বার মধ্যে বুদ্ধির তো কিছু দেখিনে। মজা দেখবারও বয়স আর নেই, সেও কিনা আত্মঘাতী মজা! খবরের কাগজ সম্বন্ধে তাঁর রহস্যকর কবিতা আছে 'ছড়া' কাব্যে।

বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন বিলাতী পত্রিকাগুলি—দি নেশন, লিটারেরি ডাইজেস্ট, এসিয়া, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা—দি নেচার ইত্যাদি। রাশিয়া ভ্রমণের পর থেকে সোভিয়েটের সরকারী সচিত্র বিবরণী-পত্রিকা কবির কাছে রীতিমতোই উপহার আসত।

উপহারের কথায় এসে, ডাঃ সতীশ বাগচীর লাইব্রেরীটির কথা মনে পড়ছে। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়ে তার সম্পদবৃদ্ধি করেছে। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের গ্রন্থাগারটি উপহার পেয়ে কবির খুবই আনন্দ হয়েছিল। কবির নিজের ব্যবহারের গ্রন্থাগার ছিল কোণার্ক গৃহে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থভবনে খুঁজলে অনেক বই বেরবে, যার পাশে-পাশে কবির হাতের অজস্র মন্তব্য আছে পেনসিলে লেখা। কী ধরণের কত বই তিনি পড়েছেন তার একটা বিবরণ এই করে আজও পাওয়া যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জর্জ মেরিডিথের লেখা তাঁর প্রিয় ছিল। পড়বার যোগ্য লেখকদের বই নির্দেশ করতে গিয়ে একবার এঁর নাম করেছিলেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশি। তাঁর লেখা 'জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার'। আশ্রমের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মশায়ের লেখা 'বঙ্গ-পরিচয়'। বই দুখানি তিনি সযত্নে পড়েছিলেন। দুখানা বইয়েরই উপহার-কপি দুটিতে কবির অনুরাগের চিহ্ন আছে। অবান্তর অংশ

কেটেছেঁটে দিয়েছিলেন। এরূপ সযত্ন অনুশীলনের পরিচয় কম বইতেই পাওয়া যায়। নিজে কিছু লেখেন নি, কিন্তু একরূপ আগা গোড়াই লিখে দিয়েছেন,—এমনিভাবে বের করে দিয়েছেন তাদের পরিচ্ছন্ন রূপটি।

৮০ বছরের জন্মদিনে কবিকে নানা জনে নানা উপহার দিলেন। কলাভবন থেকে মসোজি দিয়েছিলেন নদীর ছবি। কবির খুব ভালো লেগেছিল। ছবিটি তাঁর শয়ন-কক্ষের দেয়ালেই টাঙানো ছিল। রোগশয্যা হতে শিল্পীকে কবি বলেছিলেন,—'শিশু' বইয়ের নদী কবিতাটিকে বড়ো টাইপে আলাদা বই করে ছোটোদের জন্য ছাপাবার কথা আছে। তাতে ঐ নদীর ছবিটি অলংকরণের কাজে লাগবে।

সমগ্র ইংরেজী গীতাঞ্জলি একখানি পোষ্টকার্ডের মধ্যে হাতে লিখে কবিকে উপহার পাঠিয়েছিলেন পশ্চিম ভারতের এক লিপি-বিশারদ। দুধ খেতে মূলতানী গোরু দান করেছিলেন রাজপুতনার আওয়াগড়ের রাজা। বিশ্বভারতীকে আওয়াগড়ের রাজার টাকার দান ঘরে-বাইরে সুবিদিত, কিন্তু তিনি আশ্রমবাসীদের মিষ্টিমুখ করাবার জন্যে ভারতের সুদূর প্রান্ত থেকে পনেরো-ষোলো টিন খাবার তৈরী করে পাঠিয়েছিলেন, সে-প্রীতির কথা আছে আশ্রমের হৃদয়ে। সর্ব প্রথমে এই রাজাই কেবল আশ্রমে তাঁর একটি নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করিয়েছেন এবং সেটি অবশেষে আশ্রমকেই তিনি দান করেও দিয়েছেন। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে এক ভদ্রলোক প্রতি জ্যৈষ্ঠেই কবিকে পাঠাতেন আম। চীন থেকে একবার উপহার

এসেছিল একশ বছরের ফুল, সে-সঙ্গে প্রাচীন-কালের হাঁসের মাংসও। ছোটোখাটো একটি আন্তর্জাতিক সান্ধ্যভোজ জমেছিল তাই নিয়ে।

কবির বাতিক ছিল বায়োকেমিক। ওষুধ পরকেও বিলাতেন, কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ওর ব্যবহার-পদ্ধতিটাই ছিল দেখবার মতো। হাতের কাছে টেবিলের উপর সাজানো থাকত অষ্টপ্রহর শিশিগুলো, খানিকক্ষণ পরে-পরেই বাঁ হাত উপুড় করে নিয়ে ডান হাতের তেলোয় ঠুকে মুখে পুরতেন ঐ শিশি থেকে চার-পাঁচটি করে সাদা গুটিকা। শারীরিক পটুতা, মস্তিষ্কের স্নায়ু-সবলতা কতটা রক্ষিত হত তিনিই জানেন, কিন্তু উঠতে-বসতে ঐ বায়োকেমিকই নিয়েছিল টেনে তাঁর বিশ্বাস ও অধ্যবসায়। সংগীত-ভবনের সেতার-অধ্যাপক শ্রীসুশীল ভঞ্জের ডাক পড়ত মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি-চর্চায়।

খেয়াল খুশীগুলো ছিল অদ্ভুত রকমের। শরীরই নাকি আগে। শরীরের দিকেও খেয়াল ছিল। যে যা বলত, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে গুরুদেব তাই করতেন। একবার কে বললে,—রোজ-রোজ আমলকী ছেঁচে খাওয়া উপকারী। আশ্রমে আমলকী গাছ মেলা ; তলায় তলায় ফলের ছড়াছড়ি। গুরুদেব হুকুম দিলেন, রোজ তাঁকে আমলকী ছেঁচে দিতে হবে। কিছুদিন পরে কলকাতায় আশ্রমের অভিনয়। গুরুদেবও যাবেন। সেবার তিনি অমনি গেলেন না, সঙ্গে নিলেন আমলকী। চাকরদের প্রধান কাজই দাঁড়ালো, এতো-এতো

আমলকী ছেঁচা। সবাই অবাক! করছেন কী গুরুদেব! তা, কে শোনে কার কথা! এমনি চলল কদিন—আমলকী সেবন। সহ্যেরও সীমা আছে। হঠাৎ দেখা দিল এমনি অসুখ, নিতে হল শয্যা! তখন ডাকো ডাক্তার, আনো ওষুধ। এদিকে নাটকে যাওয়া বন্ধ, গুরুদেব রেগে সারা! সে এক ব্যাপার। যাক্, আমলকী বাতিল হয়ে গেল। তবু মৃত্যুর তিন-চার বছর আগেও স্বাস্থ্যের জন্য কত যত্ন—কাঁচা স্যালাড, কাঁচা সরষে পাতা প্রভৃতি চিবিয়ে খেতেন ভাতের আগে। সে সব বাগান থেকে তক্ষুনি তোলা হত; গোছা ধরে মূলসহ সাজানো থাকতো টেবিলে ডিসের পাশে।

ছিল আরেক ঝোঁক বাড়ি-তৈরী, আর বাড়ি-বদলানো। বৈচিত্র্যলিপ্সু কবির জন্যে বাড়ির পর বাড়ি তৈরী হত। এটাতে কিছুদিন, ওটাতে কিছুদিন থাকতেন। তাঁর ব্যবহারে লাগেনি আশ্রমে এমন পুরানো বাড়ি কমই আছে। দেহলীতে যখন ছিলেন, গ্রীষ্মের দুপুরে বারান্দায় বসে কবিতা লিখতেন। সেই রোদের ঝাঁজ, হা-হা-করা গরম হাওয়ায় লেখার আবেশ নাকি গাঢ় হয়ে উঠত। দরজা জানালা বন্ধ, আরামে সবাই বিশ্রাম করছে, আর তিনি তাঁর ঘরে লিখে চলেছেন, হাতে একখানা হাত পাখা; এই ছিল তাঁর আগেকার ধারা। শেষ বয়সেও উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণ আশ্রয় করে গেলেন উদয়নে; গেলেন কোনার্কে; সেখানে ছোটো ছোটো কোঠা, ঠিক একজনের মতোই এক-একটির আয়তন। স্থান নিলেন মৃন্ময়ীতে। তারপরে শ্যামলী—মাটির বাড়ি; সেটা বৃষ্টিতে খানিকটা ধ্বসে পড়ল।

তৈরী করালেন নূতন বাড়ি পুনশ্চ ;—কিছুদিন থাকলেন, আবার দেখা দিল মনের অস্বস্তি,—গড়ে উঠল উদীচী। এইটিই তাঁর শেষ বাড়ি।

বাড়ি তৈরী করেও কোথাও কি স্থির থাকতে পেরেছেন,—নতুন বাড়িগুলো তাঁর যে-যার-মতো পড়ে থাকতো, তিনি ফিরতেন খুশীমতো এবাড়ি-সেবাড়ি। দেখা গেল—শ্যামলীর বারান্দায় পেতেছেন আসন। লেখার টেবিল, সাজসরঞ্জাম, বইপত্তর সব সামনে সাজানো। কদিন পরেই নেই, সবকিছু নিয়ে গেলেন উত্তরায়ণের দোতলায়, উঠলেন তেতলায়, আবার কবে এলেন একতলায়। কদিন বেশ চলল। একদিন তাঁর বৌমার ষ্টুডিয়ো চিত্রভানুতে নিলেন স্থান—নয়তো উদয়নের জাপানী ঘরে (কক্ষটি অধুনা রবীন্দ্রভবনের অধিকার-গত)। কোনো বাড়ীর সামনে কাঠ-গোলাপের রাশি রাশি ফোটা ফুল ঝরে পড়ছে, লাল কাঁকরের সড়ক শোভন হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের চাপড়া, পাশে পাশে সারিসারি হিমঝুরি ও মহানিমের গাছ,—বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় তারা শূন্যকে করেছে অধিকার। কোথাও আবার চারপাশে নয়ন-ভুলানো মাঠ। এক এক জায়গা থেকে বাইরেকার এক এক রকম দৃশ্য।

কেবল বাড়ি-বদলানো নয়,—ঘর-সাজানো নিয়েও আরেক সমস্যা। কতদিন কতরকম ভাবেই না তার দৃশ্য বদলাল। একবার খেয়াল গিয়েছিল শিকে দিয়ে ঘর সাজাবেন। এখানে ওখানে ঝুলানো শিকে, শিকেয়-শিকেয় একাকার। মধ্যে বই, খাতা, বিছানাপত্তর সব কিছু। আবার ঠিক উল্‌টো হল.

অনড় অচল ব্যবস্থা। তৈরী করালেন সিমেন্টের খাট, সিমেন্টের চেয়ার টেবিল ডেস্ক্। এখনো শ্যামলীর প্রাঙ্গণে তার একটা খাট রাখা আছে।

অভিনয়ে গিয়েছেন কলকাতায়। কি মনে হল—বলে বসলেন, সাদাসিদে ভাবে থাকবেন। কম্বল হবে শয্যাসম্বল। সঙ্গে সঙ্গে কম্বলওয়ালার আমদানি হতে লাগল দলে দলে। মোটা খস্‌খসে দিশি কম্বল। গদি উঠিয়ে পঁচিশ-ত্রিশখানা কম্বল পাতা হল, তৈরী হল বিছানা। শুধু কি তাই, মেজেয় কম্বল, জানালায় কম্বল। কম্বলে জোড়াসাঁকোর ঘর ভরা। এদিকে কদিন পরেই শুরু হয়ে গেল ছট্‌ফটানি। —খেয়ে ফেল্লেরে ছারপোকা! ঝাড় বিছানাপত্তর, রোদে দে, ধুয়ে দে গরমজলে, মেরে ফেল্, শিগগির মেরে ফেল্ ওই আপদগুলোকে ইত্যাদি। করা হল সবই। কোথায় ছারপোকা! আসল কথা, কম্বলের কুট্‌কুটে রোঁয়া-ফোটার জ্বালা। গা উঠল চুলকুনিতে ফুলে। তাঁর ধারণা—এ ছারপোকারই খোঁচা। চাকরের দল রোজ সেই পঁচিশ-ত্রিশখানা কম্বল রোদে দিতে লাগল, তবু আসোয়াস্তির শেষ নেই। তখন হল মশার দোষ। এল ফ্লীট্, ঘর-দোরে তো দেওয়া হলই, বললেও অবিশ্বাস জাগবে —সোফায় তিনি বসে থাকতেন চোখ বুজে,—আর তাঁর চাকররা তাঁরই হুকুমে দরজা-জানালা সব এঁটে ঘর অন্ধকার করে নিয়ে মশামাছির লোপের জন্য তাঁর অমন গায়ে অবধি ছড়িয়ে দিত সেই অপূর্ব জিনিসটি। পিচ্‌কারী ভরে ভরে প্রায় জব্‌জবে করে ভিজিয়ে তুলত জোব্বাগুলি। এমনি কদিন গেল। তবু

রোগশয্যার পর্ব অবধি কম্বলের গদিই ছিল বহাল। তাঁর প্রতিদিনকার জীবনী আলোচনা করলে টুক্‌রো-টাক্‌রা এমনি কত কথা, কত ঘটনা কতজনের মনে পড়বে।

শুকনো দেশ বীরভূম, ঘরবাড়ি সবই মাটির দেয়াল আর খোড়ো চালের। অগ্নিকাণ্ড তাই এ অঞ্চলের সাধারণ ঘটনা। জলাভাবে আগুন নেবাবারও পথ নেই। এক-একবার লোক সর্বস্বান্তও হয়ে যায়। এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে একমাত্র উপায়—ইটের ছাদ তোলা। কিন্তু দরিদ্র সাধারণের পক্ষে তা সহজ নয়। কবি এই সমস্যার কথা খুবই চিন্তা করতেন। এ নিয়ে তাঁর শিক্ষা-প্রসঙ্গেও আলোচনা আছে। শেষে তিনি এক পথ বের করেছিলেন। দেয়াল তো মাটির থাকেই, ছাদটাকেও মাটির করে নিলে আগুনেরও ভয় থাকে না, আর সহজেও কাজ চলে। অথচ দেশীয় উপকরণে দেশীয় মজুরের দ্বারা কাজটা হওয়ায় পয়সাও বিদেশে যায় না। আবার বীরভূমের অসহ্য গরমের হাত থেকেও অনেকটা বাঁচা যায়। চরকা-খদ্দরের ধারাতেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও এতে রয়েছে। খেটেখুটে সাধারণ লোক নিজেরাই অবসর সময়ে বাড়ির সংলগ্ন জমি থেকে মাটিটা তৈরী করে ছাদ গেঁথে নিতে পারে। তবে, পথের কথা বললেই হবে না, হাতে-কলমে সেটা করে দেখালে লোকের যদি গরজ হয়। নিজের ঘরটিকেই তিনি আগাগোড়া মাটির করতে চাইলেন। পাশের গাঁ ভুবনডাঙা থেকে গৌরদাস মণ্ডল এল মিস্ত্রী। তৈরী হল তার থেকে শ্যামলী। নববর্ষে হল কবির গৃহপ্রবেশ। আশ্রমের ভিতরে

কলাভবনের ছাত্রাবাসও তৈরী হয় সেই থেকেই মাটির ছাদ দিয়ে। আগুনের হাত থেকে বাঁচা গেল তো পড়া গেল জলের হাতে। বর্ষায় ছাদ যায় ধ্বসে। কিন্তু কবি দমেননি; নূতন বাড়ি তাঁর জন্য আরো তৈরী হয়েছে। কিন্তু পুরোনো ঐ শ্যামলীর ছাদ আবার তিনি মাটি দিয়েই শক্ত করে গড়েছেন, আবার তাতে বসবাস করেছেন।

শেষ বাড়ি উদীচী, দোতলা দালান। কিন্তু একমাসের মধ্যে তা তৈরী হয়ে ওঠে ঐ নববর্ষের বিশেষ জন্মতিথিটিতে কবির গৃহপ্রবেশের তাড়াতেই। দিনরাত্রি চলেছিল রাজমিস্ত্রীদের কাজ। শেষে ঘরের মেজেতে আগুন জ্বেলে শুকোতে হয়েছিল ঘরের স্যাঁতস্যাঁতানি।

খেয়াল-খুশীর ভাবটা মানুষের সাধারণ বৃত্তি। কারো কম, কারো বেশি। প্রতিভার খেয়ালের দিকটা চিরকালই লোকের পক্ষে আগ্রহজনক। কুতূহলের সঙ্গে হলেও এই দিক দিয়ে সাধারণ মানুষ তাঁকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে এগোবে। তারপরে তো আছেই তাঁর বড়ো কথা, বড়ো পরিচয়।

ছুটি এলে ছেলেরা ছোটে বাইরে; কবিও তাদের মতোই হতেন উৎসুক—একবার বাইরে ঘুরে আসা যাক্। দার্জিলিং, কালিম্পং, মংপু, পুরী,—না হয় অন্ততঃ বরানগর, চন্দননগর—কিছু না-হয় তো কলকাতার জোড়াসাঁকো, চৌরঙ্গী, খড়দা! গঙ্গায় বোটে থাকতেন। ছুটি কাটত। বাড়ির বহুদিনকার এই বোটের নাম ছিল 'পদ্মা'। একবার সেটা মেরামত হচ্ছিল। খড়দার গঙ্গার উপর এক বড় দোতলা বাড়ি, কবি সেখানে পুজোর

সময়টা কাটাচ্ছিলেন। বৌমা প্রতিমা দেবী ও নাতনী পুপে কবির সঙ্গে ছিলেন; লেখককে কবির সঙ্গে সেবার কাটাতে হয়েছিল। এই সময়টিতেই 'মালঞ্চ' বইখানির অধিকাংশ লিখিত ও সংশোধিত হয়। শরৎ চট্টোপাধ্যায় মশায় এসেছিলেন সেবার কবি-সাক্ষাতে।

শান্তিনিকেতনে যেবার থাকতে হত, অনেকবার ঠাঁই-বদল হিসাবে শ্রীনিকেতনে নিতেন আশ্রয়। একটা কিছু পরিবর্তন চাই-ই।

আশ্রম থেকে তাঁর যাওয়া মানে,—সে যেন উৎসব ভেঙ্গে দেওয়া। ছুটি থেকে এসে আবার জমাতেন উৎসব। না যেতে পারলে কি করুণ দশা হত! যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁরাই করেছেন উপভোগ। কিছুতে আরাম নেই; ছম্‌ছমে ভাব, না হয় অভিমানের আভাস দেখা দিত তাঁর নিরীহ ভাবের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ভাবটা হত এই যে,—এই তো বেশ লাগছে, স্থান কাল পাত্র, কিছুরই অপেক্ষা নেই! ছুটি কি শুধু-একটা মানুষের বাইরের জিনিস? সে তো বস্তুলোভীদের জন্যে,—কবির ভাষায় যারা বায়ুবদলের বায়ুগ্রস্তদল।—তারা ছুটির জানে কি? ছুটি হচ্ছে মনের একটা মুক্তিস্নান; তার জন্যে পয়সা এবং রেল-যোগের চেয়ে চক্ষু এবং মনোযোগটাই বেশি দরকার। একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গিয়ে আমরা নূতনকে দেখি, নূতন হই। দেখার চোখ থাকলে দেখা যায়,—গ্রীষ্মে যে শান্তিনিকেতন, বর্ষায় সে কি তাই থাকে? নূতন পুষ্প-পল্লব তার পুরোনো হতে না হতেই শরতের কাঁচা রৌদ্র আভ'

সোনায় ভরে দেয় তৃণ-প্রাঙ্গণ। হেমন্তের হিম-শুভ্রজালে এই ধূলার রাজ্যেই জাগে মায়াপুরী। শীতের গৈরিক আস্তরণে, বসন্তের হরিৎ মেখলায়, রাগরঙ্গের নিত্য নব আয়োজনে নূতন মহাদেশ সৃজিত হয়ে উঠছে মাঠে-ঘাটে, এই তো দেখছি কত চোখের উপরই। নূতন কত পাখি, কত গান, আকাশের কত রং, —একি শুধু চোখের দৃশ্য-বদল! হাওয়া-বদল যেমন আবহাওয়ায়, তেমনি মানুষের মেজাজে। ছুটির কাজ তো এখানে বসেই হচ্ছে। তবে আর ছুটতে যাই কেন পয়সা খরচ করে? নিকড়িয়া হাওয়া-বদল হয় ঘরে বসেই। জিত কি কবিরই নয়? পূজার ছুটিতে বাইরে যাবেন। বারবার বাধা পড়ল, যাওয়া স্থগিত হল, প্রতিক্রিয়া ঘটল ছুটির এই রকম দর্শন-আবিষ্কারে। লেখা হল পত্র, লেখা হল কবিতা। প্রথমে ডাঃ কালিদাস নাগের নিকট এক পত্রে লেখা হল, তারপরে পত্রপুটের দুই নম্বর গদ্য কবিতা হল রচিত,—চিন্তাটি পাকা আসন পেল। লেখালেখি চুকে যাবার পর সেবারও বাইরে ছুটলেন—অল্পদিনের জন্যেই, তবু তো বাইরে-যাওয়া!

একবার ছুটিতে বাইরে থাকার সময়, চন্দননগরেই চোখে পড়েছিল একটি ঘর;—দেয়ালে হাঁড়ির গাঁথনি। সেইরকম করে শ্যামলীর পেছনে উত্তরপূর্ব কোণের কোঠাটি তৈরী করালেন, হাঁড়িগুলোর পিঠের দিক রইল বাইরে। মুখের দিক দেয়ালের মধ্যে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। ওর গহ্বরের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে আসতে আসতে গরম হাওয়ার ঝাঁজটা মিইয়ে যায়। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে

এসে, ঘর ঠাণ্ডা রাখবার এই অভিনব প্রণালী সমর্থন করেছিলেন।

এ সব তো গেল তাঁর খেয়ালের দিকের কথা। তাঁর মনের মতো কিছু হলে খুশীর লক্ষণটি ছিল, চেয়ারে বসা থাকলে, গা একটু এলিয়ে দিয়ে ঘন ঘন পা-দোলানো। প্রস্তুত হয়ে ওঠবার লক্ষণ ছিল সশব্দ গলাঝাড়া। যখন-তখন, উত্তরায়ণ কাঁপানো শব্দ। আশ্রমের বহুদূর অবধি শোনা যেত।

একটি দৃশ্য প্রায়ই সবার চোখে পড়ত—হাত দুখানি পিছন দিকে, দেহ ঈষৎ সামনে ঝুঁকে আছে, পা অবধি আলখাল্লা—বাসন্তী নয় পলাশ রঙের, সাদা চুল, সাদা দাড়ি, চলেছেন কবি অঙ্গন পেরিয়ে—হয় উদয়ন থেকে শ্যামলীতে, না-হয় শ্যামলী থেকে উদয়নে। মধ্যে কোথাও থামা নেই; গতিতে কোথাও বৈষম্য নেই—একটানা সোজা গন্তব্য তাঁর নিশানা।

চারদিকের বাগানে ফুল, টেবিলের ফুলদানিতে ফুল, ফুলের মালা, কবির পরিবেশ সুগন্ধে ভরা। প্রসাধনে ওডিকোলন ছাড়া আর কিছুর ব্যবহার ছিল না।

কবিকে গা-খোলা অবস্থায় বাইরে বড়ো একটা দেখা যায়নি। ঘরে কোনার্কে স্নানের পূর্বে একখানি সাদা তোয়ালে গায়ে দিয়ে কবি ওষধি-তেল মালিশ নিতে তৈরী হয়েছেন, সে-ফাঁকে দু-একবার স্বর্ণকান্তিচ্ছায়া নেহাৎ কাছের লোকের চোখে পড়েছে। পা ছুঁয়ে কবির স্পর্শ পেয়েছে লোকে প্রণামে, আর পেয়েছে বৈদেশিকেরা করমর্দনে। প্রসন্ন মনে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন, অনেকের কাছেই সে সৌভাগ্যের স্মৃতি অবিস্মরণীয়।

কবির প্রসন্নতা পাওয়াও সবক্ষেত্রে সহজ ছিল না। শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা' ছিল। সে সভা একবার স্থির করে কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্ববারের 'জয়ন্তী উৎসর্গে'র মতো করে একখানি সংকলন-গ্রন্থ কবিকে অর্ঘ্য দেওয়া হবে। অনুরাগী ও বিশিষ্ট লেখক-মণ্ডলীর নিকট অনুষ্ঠানটির প্রস্তাব ও রচনা-আহ্বান নিয়ে নিমন্ত্রণ গেল। শুভদিন এগিয়ে আসছে। উদ্যোক্তাদের চেষ্টা বাড়ছে। কথাটা কবি জানতে পারলেন। প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে তিনি বিরক্তি দেখাচ্ছিলেন। ধরে নেওয়া যাচ্ছিল ব্যাপার তাঁকে নিয়ে, সংকোচ তাঁর স্বাভাবিক। সপ্তাহখানেক আগে, কবি দারুণ উগ্র হয়ে উঠলেন। কারু কথায় কান দিলেন না। নিজে ইংরাজী ও বাংলায় পাণ্টা চিঠির মুসাবিদা করলেন, আমন্ত্রিতবর্গের নিকট তা ডাকে পাঠালেন। বোধ হয় খবরের কাগজেও তা দিয়েছিলেন। জানালেন, এ অনুষ্ঠান তাঁর অনভিপ্রেত, কেউ যেন রচনাদি না পাঠান। সকলের শুভেচ্ছা-লাভই তাঁর একমাত্র কাম্য। বলছিলেন,—শান্তিনিকেতনে কোনোক্রমেই আমার পূজা চলবে না। আগ্রহের মুখে নিগ্রহের চূড়ান্ত। উদ্যোক্তাদের সেবার এক নূতন অভিজ্ঞতা হল। তাঁর নিষেধ-পত্রখানি অনেকের নিকট এখনও থাকতে পারে।

আবার, খুশী হয়ে লোককে খুশী করতেও বিলম্ব ছিল না। তখন ভরা পালে বাতাস লেগে পাড়ি জমিয়ে চলেছে তাঁর গদ্য-কবিতা। বিশেষ ভঙ্গিতে লেখা। সবার মধ্যে সাড়া জাগল। সে পন্থায় লেখাও চলল অনেকের। নিজেও লিখে ফেললাম একটা।

কাগজপত্রের তলাতেই লেখাটা পড়েছিল। পরে একদিন চোখে পড়ে যেতে লেখাটা মন্দ লাগল না। কবির কাছে যাচিয়ে নেবার কৌতূহল জাগল। সকাল বেলা, পুনশ্চ গৃহে কবি ছবি আঁকতে ব্যস্ত। এক ফাঁকে সেটিকে কবির সামনে ধরা গেল। বুক দুরু দুরু,—ওদিকে কিন্তু ইতিমধ্যে লেখাটিতে কবির চোখ বুলানো হয়ে গেছে। বললেন,—রেখে যাও, দেখব এখন। এটুকু ভরসাই যথেষ্ট। কূল পাওয়া গেল। সেই দুপুরেই দেখা হতে কবি কাগজটা দিলেন ফেরৎ। বললেন,—সব জিনিসই গদ্যের নয়। যেটা যে পথে আসতে চায়, সেটাকে জোর করে ঘুরিয়ে দিলে ঠিক জিনিসটি মিলে না। লেখাটিতে কবির সংশোধন আশা করছিলাম, কিন্তু কোথাও একটু আঁচড়ের দেখা নেই। দৃষ্টি আর-একটু তলার দিকে যেতেই মুহূর্তে তড়িৎ খেলে গেল মনে। গোটা কবিতাই লেখা রয়েছে সেখানে—নূতন করে, স্বয়ং কবিরই হস্তাক্ষরে। তাতে কোথাও একটি কাটাছেঁড়া নেই, দুবার করে ভাবতে বা লিখতে যাওয়ার চিহ্ন নেই, গোটাটা একেবারেই পদ্যে লেখা। বললেন,—কিছুই করিনি, দেখ মিলিয়ে, ওর শব্দও বোধ হয় যা ছিল সবই ঠিক আছে, কেবল ছন্দটা দিয়েছি একটু বদলে। ওটা যে রূপে রসে পদ্যের জিনিস; পদ্যেই আসতে চায়। এসেও তা গিয়েছিল। যেটুকু ঘোরানো তা সোজা করে দিতেই ওতে মিল আপনি এসে গেছে। সে-মিলও ওর মধ্যেই ছিল, এজন্যই আর আমাকে কিছু করতে হয়নি। রচনাটির নাম একটা চাওয়া হল। নাম দিলেন 'অভাবিত'। প্রকাশের অনুমতি,—তা-ও। বললাম,—এর এই রূপটা তো

আমার হাতের নয়, আপনারই দান। কবিতাটি আমার নামে প্রকাশ হওয়া সত্যও নয়, উচিতও নয়। পাশাপাশি একই সঙ্গে দুটো লেখাই প্রবাসীতে ছাপবার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। কবি তাঁর পদ্য-কবিতাকে ধরে ধরে গদ্য-কবিতায় তখন রূপান্তরিত করছেন। অন্যের গদ্য-কবিতাও করছেন সংশোধন। কিন্তু গদ্য-কবিতাকে পদ্য করা হল এই প্রথম এবং শেষও বটে। কোন্ কথা গদ্য-ভঙ্গিসীমার আর কোন্‌টা পদ্যের,—তার একটা নজির এতে আছে। কবি তা স্বীকার করলেন। তখন তাঁকেই অনুরোধ করা গেল, এসঙ্গে একটি মন্তব্য জুড়ে দিতে। কিছুতেই এতে জড়িত হবেন না; অবশেষে লেখকের ভাগ্যে ফল ফলল। প্রবাসীতে গদ্য ও পদ্য দুই পাঠ নিয়েই কবিতাটি মুদ্রিত হয় দুজনের নামে, কবি-লিখিত বকলম মন্তব্য যোগে।

অভাবিত

[আধুনিক গদ্যকাব্যের স্পর্শক্রামকতায় অভিভূত হয়ে একখানা গদ্যকাব্য রচনা করেছিলুম। দুঃসাহসে ভর করে কবির সম্মুখে সেটা যখন নিবেদন করলাম তিনি আমার স্পর্ধা ক্ষমা করে সেটাকে পদ্যায়িত করে দিলেন! নিজের নামেই চালাবার লোভ ছিল, যথাকালে সুবুদ্ধি মনে উদয় হোলো, ভাবলাম চোরবিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। তাই সমগ্র ইতিহাস সমেত জিনিসটা লোকসমক্ষে প্রকাশ করা গেল।]

লেখকের রচনা

এখনই, এই মুহূর্তেই, বুঝে পেলাম সব।
আর তো কোনো অপেক্ষা নেই।

সামনে রাত্রির নৈঃশব্দ্য পাথার,
আকাশে জ্বলে তারা,
শূন্য পথ,
মাঠের শেষে বনশ্রেণীর কালো রেখা প্রসারিত।
—যেন ওড়ার মুখে ডানামেলা
মস্ত একটা বাদুড় ॥
ক্ষণেক আগেই ভেবেছি,—
অনেক আছে বাধা, বিশৃঙ্খলাই বা কত।
নাই যত্ন, নাই আয়োজন, কেবলি ত্রুটি।
আর কিছু কি হবে ?
কিন্তু হোলো তো,—
যা ভাবিনি তাই—
হোলো এক মুহূর্তেই
মন ভ'রে ডুবায়ে দিয়ে মন
জাগছে শুধু একটিমাত্র শান্তমধুর
'তুমি আছ'।

রবীন্দ্রনাথের রচনা

এখনি এই মুহূর্তেই বুঝে পেলাম সব,
থামিয়া গেল জীবনের সকল কলরব।
সামনে রাতি রয়েছে সীমাহারা,
নৈঃশব্দ্যের বক্ষ জুড়ে আকাশে জ্বলে তারা,
সকল পথ করিয়া গ্রাস শূন্য অবারিত
মাঠের শেষে ঘন বনের কালিমা প্রসারিত।

এখনি এই মুহূর্তেই বুঝে গেলাম সব,
থামিয়া গেল জীবনের সকল কলরব।
সামনে রাশি রয়েছে সীমাহারা,
নিঃশব্দের ঢেউ জুড়ে আকাশে কাল তারা,
সকল পথ নদীর গ্রাম শূন্য অবারিত,
মাঠের শেষে ঘন চাঁদের কালিমা প্রসারিত।
ওপারে মুখে মেলিয়া তারা চমকে দেখে রাগে।
ভেবেছি কিছু আগে,
অনেক কথা, বিস্ময়ে সামনে গেছে ছুটি—
মনের মাঝে আঁধারের এ-টি, —
শুধু দেখ, জানি কি সেই কথা—
মুহূর্তে সম্মুখে এখনি ফুটিল তা, —
ফুটিল মন, ফুটিয়া গেল সকল বেদনা,
রয়েছে শুধু একটি চেতনা
পূর্ণ করি আমার মনোভূমি
একাকী আছ তুমি॥

ম - (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওড়ার মুখে মেলিয়া ডানা বাদুড় যেন জাগে।
ভেবেছি কিছু আগে,
অনেক বাধা, বিশৃঙ্খলা অনেক গেছে জুটি—
অনেক আছে আয়োজনের ত্রুটি,—
তবুও দেখ, ভাবিনি যেই কথা—
মুহূর্তের মন্ত্রবলে এখনি ঘটিল তা,—
ডুবিল মন, ডুবিয়া গেল সকল বেদনা,
রয়েছে শুধু একটি চেতনা
পূর্ণ করি আমার মনোভূমি
একাকী আছ তুমি॥

রচনা-প্রসঙ্গ

ছবি আঁকতে পেলে কবি খুব খুশী থাকতেন। লেখার সময় থাকতেন গম্ভীর, গানের সময় বাহ্য-উদাসীন,—এর যে-কোনো একটা-কিছুতে মন অধিকার করেছে তো একটানা চলেছে দিনকতক তার আধিপত্য। সুরে সুরে চারিদিক ভরিয়ে চলেছে গানের জোগান, হাত-পা টেবিল রংএ ভরিয়ে চলেছে ছবি-আঁকা, আর লিখছেন তো লিখছেনই। ঝোঁক বেঁধে আসত তাঁর কবিতা, নিজেও সে-কথা বলতেন, তখন আর বাছবিচার নেই। হাতের কাছে যা পেয়েছেন, ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজেও অনেক মূল্যবান রচনা লিখে গেছেন, দেখবার অবসর নেই সেটা কি বইর মলাট, না খবরের কাগজের মোড়ক। যদি বলা হত, একটু ভালো কাগজ দেখে লেখবার কথা, যাতে দুদিন টেঁকে, রক্ষণ-উদাসীন কবি সে যুক্তিতে উঠতেন ব্যঙ্গ করে। লিখে লিখে আবৃত্তি করে লেখায় এগোতেন। শুধু পদ্য নয়, গদ্যেও ছন্দ এবং শব্দঝংকার নিতেন ঐ করে যাচিয়ে। সে-সময়কার অবস্থা বাইরের লোকের বিশেষ চোখে পড়েনি। ঘরের লোকেরও হয়তো দূর থেকে লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়েছে মাত্র। লোক দেখলে সে আবৃত্তিও যেমন বন্ধ থাকত, অসম্পূর্ণ লেখাও দেখতে পেত না কেউ। লেখা স্বগতভাবে পড়তে পড়তে চোখে-মুখে এবং হাতের মুদ্রায়ও তাঁর আপনা থেকেই এসে যেত ব্যঞ্জনা। আকস্মিক উদাত্ত স্বরে ঘর উঠত কেঁপে।

লেখাটি শেষ হয়ে গেলে আসত কপির পালা। নিজেও অনেকবার কপি করতেন। এ কাজে তাঁর অধ্যবসায় ছিল অসাধারণ। বড়ো বড়ো লেখা, এমন কি এক একবার গোটা বইও দু-তিন কপি করে লিখতেন।

নবপর্যায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকা থেকে চেয়ে পাঠাল কবিতা। 'পক্ষীমানব' কবিতাটি কপি করে পাঠানো হল ডাকে। কবির দপ্তরে যখন ছাপা হয়ে এল, দেখা গেল পত্রিকার মুখপত্রেই রয়েছে সে-কবিতাটি। তলায় কবির নাম সমেত গোটা কপিটাই ব্লক করা। ওদিকে স্বাক্ষরসহ সব কপিটাই ছিল লেখকের হাতের। বুঝতে বাকি রইল না, পত্রিকাওয়ালারা অতিরিক্ত উৎসাহে কবির হস্তাক্ষর ভুল করে বসে আছেন। সেই থেকে কবিও সাবধান হলেন, প্রত্যেক লেখার কপিতে রাখতেন স্বাক্ষর। বকলমের বেলায় সইর স্থলে পাশে লেখা থাকত স্বাক্ষরিত বলে। বিশ্বের মনীষীদের হস্তাক্ষর সংগ্রহের মধ্যে কবির লেখাও আমেরিকায় সংগৃহীত হয়ে আছে। কলম বেশিবার না উঠিয়ে অবাধে লিখে যাওয়াই ছিল তাঁর লেখার একটি বিশেষত্ব।

শান্তিনিকেতনের মানুষের অনুপাতে প্রকৃতির কথাই কবি বেশি বলেছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বলতেন,—একটা বড়ো উপন্যাস লেখার মতো ছিল এই শান্তিনিকেতন। বিচিত্রের সমাবেশে এই আশ্রম। নানা দেশের নানা জাতের লোক, তাদের কত রকম আচার-ব্যবহার, কত মনস্তত্ত্বের খেলায় গড়ে উঠেছে এখানকার জীবন; শুধু সুখ-দুঃখের রাগানুরাগের

রস নয়; মননেরও নানা রহস্যময় বাস্তব জটিলতা রয়েছে এর মধ্যে, আর সব কিছুকে জড়িয়ে আছে প্রকৃতির ঋতু-পর্যায়ের অপূর্ব লীলা।

এরূপ আর-একটি রচনার সংকল্প ছিল। 'যোগাযোগ' উপন্যাস বেরবার পর থেকে তার দ্বিতীয় খণ্ড লেখবার জন্যে তাগিদ লেগেই ছিল। কিন্তু মন বসিয়ে কোনোটাই লেখবার আর সময় হল না।

অভিনয়ের জন্যে অন্যের লেখা 'যোগাযোগে'র নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি নিয়ে শিশির ভাদুড়ি মশায় একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কবির কাছে। কবি স্থানে স্থানে তা সংশোধন করে দেন। দু-তিনখানা গানও লিখে দেন। নূতন লেখা অংশগুলো ওঁদের কপি করে দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত আনবার জন্যে লেখককে নাট্যাচার্যের সঙ্গে যেতে হয়েছিল কলকাতায়। সে-যাত্রায় ভাদুড়ি মশায় সিংহসদনে সেক্স্পীয়ার ও রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে শোনান।

'মালঞ্চ' উপন্যাসখানিকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে শান্তি-নিকেতনে একবার অভিনয় করবার কথা হয়। এমনিতেই সমস্তটা বই কথাবার্তায় ভরানো। অধ্যায়গুলোকে দৃশ্য করে বর্ণনার অংশগুলোকে প্রযোজনার নির্দেশের মধ্যে ভরে দেওয়া গেল। কথাবার্তার অংশ প্রায় যথাযথই রইল; এই করে তিনচারখানা একসারসাইজ বুক-এ 'মালঞ্চে'র নাট্যরূপ দাঁড় করানো হল। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত আর অভিনীত হয়নি। 'যোগাযোগ' এবং 'মালঞ্চে'র উপরোক্ত পাণ্ডুলিপি দুটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

একবার পঁচিশে বৈশাখের সময় পূর্ববঙ্গের চাঁদপুর সহরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের আয়োজন হয়। সেই উপলক্ষে অভিনয়ের জন্যে কবির 'গল্পগুচ্ছে'র 'অপরিচিতা' গল্পটির নাট্যরূপ দেওয়া একখানি পাণ্ডুলিপি ডাকে পাওয়া গেল। রচনাগুণে লেখাটি কবির অনুমোদন নিয়ে ফিরল। লেখক আমাকে এ সম্পর্কে পত্র দিয়েছিলেন। নাম ছিল শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়। তিনি তখনো স্বনামধন্য হয়ে 'দৃষ্টিপাত'-সীমায় আসেননি—'যুগান্তরে' যাযাবর হয়েই ফিরছেন।

'কথা ও কাহিনী'র 'সামান্য ক্ষতি', 'গল্পগুচ্ছে'র 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'দালিয়া' গল্পদুটি মূক-অভিনয় আকারে প্রযোজিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে শান্তিনিকেতনের কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে রূপায়িত করে কবিকে তা দেখিয়েছিলেন শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। প্রায়বারই গ্রন্থাগারের বারান্দায় এ সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত।

কবি 'রাজা' নাটক নূতন করে লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট পাতা লেখা হয়ে গিয়েছিল। খাতাটি থাকত কবির টেবিলেই। লেখা এগোত না, অনেকদিন এমনিতে তা পড়েইছিল। 'রাজা' নাটক অভিনয়ের সময় একদিন যখন খোঁজ পড়ল, দেখা গেল সেটির পাত্তা নেই কোথাও। কবির ক্রোধ ও মনস্তাপের সীমা রইল না। নিশ্চয়ই চিরাচরিতক্রমে না বলে কেউ পরের দ্রব্য গ্রহণ করে থাকবে। পরের সৌভাগ্যের তুলনায় নিজের নূতন রচনা এবং একটি বড়ো সৃষ্টির সম্ভাবনা লোপের দুর্ভাগ্যে বহুদিন কবি ম্রিয়মান। অনুচরদেরও তার জের পোয়াতে হল।

সত্যিই তো, এই দুর্ঘটনায় তাদেরও অনবধান জড়িত নিশ্চয়ই। কিন্তু কী-ই বা করা যায়। মাঝে মাঝে কেবল কবির বিষণ্ণ মুখ দেখা এবং আপশোষ শুনে মন খারাপ করাই সার হল। কিন্তু এমন দুষ্কার্য করতে পারে কে! জিনিসটা যে দুর্দমনীয় লোভের তা স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু না বলে! —বছরখানেক বাদে; একদিন এই রকম আরো পাঁচটা লোপাট-করা জিনিসের গল্পের মুখে ঐ পাণ্ডুলিপির কথা উঠতেই কবির নব-পরিণীত দৌহিত্রী-জামাতা শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর কাছে প্রকৃত ব্যাপারটা শুনা গেল,—কে বলে হারিয়েছে, সেটা যে রয়েছে সযত্নে তাঁর কাছেই! কবিই একদিন দান করেছেন সেটি নিজ কন্যা মীরা দেবীকে। সেখান থেকে স্নেহোপহারে জিনিসটি হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র, এই নিয়েই এদিকে এত কাণ্ড। কবিকে এক সময়ে বলা গেল ব্যাপারটা। বলতে লাগলেন—তাই নাকি। তা হবে, তা জিনিসটা থাকলেই ভালো। তাঁর বহুদিনের মনের ভার গেল নেমে। কিন্তু সে-লেখা আর এগোল না।

তেমনি মহাভারতের বিষয়েও কিছু লেখার ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত থাকত টেবিলে। পড়াশুনায় এগিয়েছিলেন, নোট করাও শুরু হয়েছিল। সে-সময়কার ডায়রিতে কবির নিজের হাতের লেখা বিষয়-তালিকাটি এখনো রবীন্দ্রভবনে থাকবার কথা। কিন্তু এ চেষ্টাও রইল অসম্পূর্ণ। তাঁর পরামর্শেই বিদ্যাভবনের গবেষক পণ্ডিত সুখময় সপ্ততীর্থ মশায় লেগেছিলেন 'মহাভারতের সমাজ' রচনার কাজে।

পাণ্ডুলিপিতে পণ্ডিত মশায়ের লেখার পাশে-পাশে কবি স্বহস্তে মন্তব্য লিখে দেন।

'ছেলেবেলা' বইখানি আশ্রমের অধ্যাপক গোঁসাইজির প্রস্তাব থেকে লিখিত হয়, সে-কথা কবি নিজেই জানিয়ে গেছেন বইখানির ভূমিকায়। এরূপ ভাবেই আরেক-খানি বইও কবির লেখা হয়েছে—অনুরোধের থেকেই। পাঠ-ভবন থেকে কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক সংকলন করে প্রকাশের কথা স্থির হয়। সম্পাদক হন অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশ রায়। 'সহজ পাঠ' ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ ও 'ইতিহাস পরিচয়' বেরিয়ে যাবার পর, তিনিই গুরুদেবকে ধরে বসেন গল্প ও কবিতার পর্যায়ক্রমে ছোটদের উপযোগী একখানি দ্রুত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য। তা থেকেই শেষে দাঁড়াল 'গল্পসল্প'র সৃষ্টি।

নূতন গদ্য-কবিতা লেখা হল, আশ্রমবাসীদের গুটিকয়েক পড়ে শোনালেন। তারপরে আর বিরাট সভার সামনে পড়েননি, ছোটো একটি ঘনিষ্ঠ রসিকমণ্ডলীতেই পড়েছেন। একজন তাঁর খুব মনের মতো শ্রোতা ছিলেন—ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর ছোটো ভাই পরলোকগত অজিত চক্রবর্তী। কোনো পাঠমণ্ডল বসবার সময় তাঁকে খবর দিতে বলতেনই। অজিতবাবু কিন্তু গদ্য-কবিতার তেমন ভক্ত ছিলেন না। কবির পদ্য-কবিতারই ছিলেন পক্ষপাতী। বলতেন,—কবিকে আসতেই হবে ফের পদ্যে। 'পুনশ্চ,' 'পত্রপুট,' 'শেষসপ্তক', 'শ্যামলী'তে গদ্য কবিতার ধারা চলল ; সাহিত্যে তার আসন পাকা হল, কবি ফিরলেন আবার মিলের দিকেই।

শেষদিকে কবিতা আর প্রবন্ধই লেখা হয়েছে বেশি। গল্প লেখার ইচ্ছা থাকলেও লেখা তেমন হয়ে ওঠেনি। বয়সের ক্লান্তি দিত বাধা। কল্পনা তা বলে অচল থাকেনি। গল্পের প্লট তৈরী করতেন, ছড়িয়ে দিতেন একে-তাকে। একটি প্লট পাঠিয়েছিলেন পত্রে পুরে সুবিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক 'বনফুল' ওরফে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে। আর একটি এরূপ প্লট আছে শ্রীমতী রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে জানা যায় শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকেও তিনি শুনিয়েছিলেন এমনি একটি গল্প। অনেক প্লট শেষ পর্যন্ত গদ্য-কাব্য ও পদ্য-কথিকায় সংক্ষেপ আকার নিয়ে রয়েছে শেষের কাব্যগুলোতে। বলতেন,—লোকে কি আর তা বুঝবে! দাম দেবার বেলা এক পয়সাও দেবে না। কে জানবে, এক-একটা গোটা উপন্যাসকে ভরে দিয়েছি এক-একটা কবিতায়! তাঁর 'পরিশেষ,' 'পুনশ্চ,' 'বিচিত্রিতা,' 'বীথিকা,' 'পত্রপুট,' 'শ্যামলী' ইত্যাদি কাব্যগুলো এরূপ অজস্র গদ্য-কবিতায় ভরা। 'গল্পসল্প'র রচনাগুলো থেকে বোঝা যায় কবির কথা কত সত্য। তাতে যেমন আছে গল্প, তেমনি রয়েছে তাঁর কবিতার রূপ।

দুঃখ করতেন নিজের 'ছড়ার ছবি' বইটির জন্যে। শিশুদের পাঠ্য বলেই ও-বইটির বাজার-চল। কিন্তু 'শিশু' কাব্যটির মতো তা আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই উপভোগ্য হবে বলে ছিল কবির ধারণা। প্রকাশ হলে বইটির তিনি আদর দেখে যাননি। না কেনায়, না সমালোচনায়, বাজারে জাগেনি তেমন বিশেষ উৎসাহ। বলতেন,—যত্ন করে বইটা লেখা ছিল, লোকে বুঝল

কই? এমনি দুঃখ ছিল তাঁর 'পরিশেষ' কাব্যটির জন্যে। অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রয়েছে ওতে। লোকের সায় পায়নি কিন্তু কবির দরদ ছিল—এমন বই আরেকখানা তাঁর 'সে'। গদ্যকাব্যগুলোর জন্যে কবির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ওদের আদর দেখে সুখী হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেতে পেরেছিলেন।

মনোভঙ্গের কারণ ছিল, নূতন বই বেরলে সমালোচনার পালায়। পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বেরত তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহন করত বইর বাহ্যিক পরিচয়। ভাবে ও শিল্প-সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে সর্বাঙ্গীন পরিচয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করেছেন অল্প সমালোচক এবং তাদের অল্প লেখাই কবির হৃদয় অধিকারে হয়েছে সমর্থ।

বলতেন,—এর চেয়ে সমালোচনা বের না হওয়াও ভালো। কতকগুলো অবান্তর বকুনিমাত্র। লেখবার না থাকলে না লিখলেই হয়। কিন্তু নিজেই আবার পরিহাসের সঙ্গে উপভোগ করতেন সমালোচকদের অসহায়তা। বলতেন—ওরা কাঁহাতকই বা লিখবে! বইর পরে বই! সমালোচনায় নূতন কথা কতই বা জোটাবে!

মৃত্যুর দিন-কয়েক আগে কবির মন ভরিয়ে দিয়েছিল বাইরের একটি লেখায়। সাধুবাদে এমন আকুলতা কমই দেখা গেছে। 'পরিচয়ে'র শেষ রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যার 'গল্পগুচ্ছে'র সমালোচক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রকে পত্র পাঠালেন, ঠিকানা না জানা থাকায় সম্পাদকের মারফতে। বহুদিন অপেক্ষার পর সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের অক্লান্ত সাধনার মূল্যবান

থাঁটি উপলব্ধি পেয়েছিলেন ঐ লেখাটিতে। আর, ঠিক সেই সময় তা পেয়েছিলেন যখন ঐ বিশেষ দিক দিয়েই আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনা তাঁর বিরুদ্ধতায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

একদিন বেলাশেষে এলেন শ্যামলী-প্রাঙ্গণে শিশুসহ এক দম্পতি। এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখছেন। অনেকেই এরূপ দেখে যান, কৌতূহল জাগল না। পরদিন ভোরে দেখা গেল, কবির হাতে একটি নূতন কবিতা। একটু সময়ের মধ্যে আগন্তুকরা কবিকে কতখানি নাড়া দিয়ে গেছেন, তারই পরিচয় রয়েছে কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে। বিস্মিত ঔৎসুক্যের উত্তরে কবি বললেন,—ঐ যে কাল সন্ধ্যায় মেয়েটি এসেছিলেন, উনিই শুনিয়েছিলেন গান। ওঁর গলার সুর ওর মানুষটাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল সঙ্গীত মূর্তিমতী। কবিতাটি 'গানের স্মৃতি' নামে বেরিয়েছিল 'বিচিত্রা'য়, প্রথম পঙক্তি—

কেন মনে হয়
তোমার এ গানখানি এখনি যে শোনালে তা নয়।

চিঠিপত্র কবিকে লিখতেন রাজ্যের লোকে, কবিও লিখতেন কত লোককে। অসংখ্য চিঠির জবাব যেত তাঁর দপ্তর থেকে। কবির হাতের চিঠিই যে সকলে আশা করত, তা স্বাভাবিক। অনেক চিঠি তো সেই লক্ষ্যেই থাকত তাক-করা। অনেক ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোকের জরুরি কথা পড়ে রয়েছে পিছে, জবাব টেনেছে সাধারণ লোকের একটি সাধারণ জিজ্ঞাসা। সেক্ষেত্রে রচনাটি ভালো,—এই তার বড়ো জোর; আর নয়তো আছে

তার সহজ স্বচ্ছ চিন্তা-গভীরতা। আশার বাইরেও অনেক সাধারণ ক্ষেত্রে মিলবে কবির অনেক মূল্যবান চিঠি।

শেষদিকে প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে যে 'পত্রধারা' বেরিয়েছিল, তার মূলে একটি রহস্য আছে। দপ্তরে কবির সম্পূর্ণ অগোচরে আমরা একবার একটা ফাইলের ব্যবস্থা করেছিলাম, 'পাগলা ফাইল' বলে। যত সব অদ্ভুত আজগুবি চিঠির নমুনা থাকত তাতে সংগৃহীত। পাবনার ওদিককার এক মুসলমান ভদ্রলোকের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে এদিকে ঐ ফাইলে প্রায়ই ব্যারিং চিঠি কিছু-কিছু জমত। সহজ পথে উত্তর না পেয়ে, শেষে রেজেষ্ট্রী হয়ে আসত তাঁর চিঠির গাদা।

একবার একই হাতের লেখা, প্রথম পোস্টকার্ড পরে খামের কয়েকখানা মোটা চিঠিরও গতি হল ঐ বিশেষ ফাইলে। দু-চার দিন বাদেই ডাক পড়ল,—জোনাকির চিঠি চাই। জোনাকির চিঠি? শুনা গেল,—ঐ যে, সব কপিং-পেনসিলে লেখা! খোঁজাখুঁজির ধুম পড়ে গেল, কিন্তু কোথাও তো নেই! শেষটা, খোলা গেল 'পাগলা ফাইল'। পত্রগুলি কবির হাত হয়ে যখন উত্তর নিয়ে ফিরে এল, সঙ্গে নির্দেশ এল,—পত্রগুলি বিশেষ বাবস্থায় রক্ষণীয়। তখন কৌতূহলী হয়ে দুপক্ষের লেখালেখি লক্ষ্য করা যেতে লাগল। মহাকবি কিন্তু হেরে গিয়েছিলেন,— সংখ্যার অজস্রতায় এবং রচনার কল্লোলিত বেগে পূর্বপক্ষ ছিলেন এতই অগ্রসর। আগাগোড়াই সে পত্র ভরা থাকত উল্টাপাল্টা লাইনের যদৃচ্ছ লেখার ছাপে। কখনো কালিতে, কখনো

পেনসিলে—এই চলেছে বরাবর। কিন্তু কবি খুঁটে-খুঁটে সে সবই পড়তেন এবং কী যত্ন সহকারে সে চিঠির জবাব দিয়েছেন, একটানা এক বছরের প্রবাসী থেকে তা জানা যাবে। অবশ্য পরে, সাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখিকা পূর্বসূত্রদ্বারা কবির স্নেহের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে নেবার সুযোগ পান, কিন্তু যতই সে সম্বন্ধের দাবি-দায় থাকুক, যত বড়ো সম্ভ্রান্ত ঘরের দুহিতা বা ঘরনী তিনি হোন, কবির এত-সব সেরা পত্রলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ে নয়, তাঁর চিঠির সরস সুতীক্ষ্ণ সাবলীল রচনা গুণ থেকেই। কিন্তু তিনি কোনোদিন সাহিত্যের আসরে দেখা দেননি। হেন-বিষয় কম ছিল, পত্রে যা তাঁর সুললিত রচনার বিষয় হয়নি। কবি নিজে থেকে দেখেশুনে দিয়ে তাঁর একটি কবিতা 'জোনাকি' নাম যোগে ছাপিয়েছিলেন 'বিচিত্রা'য়। বলতেন,—আমি পারিনে অমন সুন্দর করে লিখতে! এত ঐশ্বর্য্য, এত অজস্রতা, কিন্তু আশ্চর্য হই, যত-কিছু ঐ পত্রেই ; সাহিত্যের প্রকাশ্য রচনায় এই সর্বমুখী সুনিপুণ কলম রইল একেবারেই বন্ধ্যা হয়ে।

প্রবাসীর 'পত্রধারা' সংগ্রহ করে বই ছাপাবার চেষ্টাও হয়েছিল কবি বেঁচে থাকতেই। কিন্তু বিরুদ্ধ অনেক কথা সাধারণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে বলে সে চেষ্টা তখন স্থগিত রাখা হয়।

একসময়ে কবির খাতার পিঠে দেখা গেল দুটি পঙ্‌ক্তি। তাঁর মন যে সকলের মনেই সহজ প্রবেশ খুঁজেছে, কর্মচারীর

প্রতি প্রভুর কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে স্নেহ-জ্ঞাপক এই পঙ্‌ক্তি দুটি তারই নিদর্শন। লিখেছেন,—

লেখার যত আবর্জনা জেনে রেখো সকলে,
সমস্ত রয় কর মশায়ের দখলে।

এরূপ লেখা আরো আছে।

রোগশয্যায় কবির লেখবার অভ্যাসকে বাধা দিচ্ছে ক্লান্তি। সকালে অফিসের কাজে গিয়েছি। কবি উত্তরায়ণের উদয়ন-গৃহের একতলার পেছনের বারান্দায় রয়েছেন—আরাম কেদারায় আধশোয়া থেকে পরিচর্যাকারীদের সঙ্গে নানাকথায় রত। কাছে যেতেই, আশেপাশের লোকদের মধ্য থেকে একটি গুঞ্জনধ্বনিতে স্বাগত সম্ভাষণের কথায় শোনা গেল,—এই যে, জানেন, কাল আপনার নামে হয়ে গেছে। কী হয়ে গেছে, জানা না থাকলেও ব্যাপারটা যে সৌভাগ্যসূচক, আকারে-ইঙ্গিতে তা বুঝতে বাকি রইল না। কানে এল, কবি বলছেন,—লেখাটা পাওনি? ও ঘরেই তো কোথায় টুকে রেখেছে। কপি করে সুধাকান্তকে দিয়ো।

লেখাটা সংগ্রহ করা গেল। শুনলাম রাত্রে কবি এই ছড়াটি বলে গেছেন, খাতায় তা টুকে নেওয়া হয়েছে। একরূপ অবিশ্বাস্য দৃষ্টির মধ্য দিয়েই পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি কয়টি পড়ে গেলাম, দেখলাম লেখা রয়েছে—

বাঙাল যখন আসে মোর গৃহদ্বারে
নূতন লেখার দাবি লয়ে বারে বারে
আমি তারে হেঁকে বলি সরোষ গলায়
শেষ দাঁড়ি টানিয়াছি কাব্যের কলায়।

মনে মনে হাসে
তবুও সে ফিরে ফিরে আসে তারপর এ কী!
সকালে উঠিয়া দেখি
নির্লজ্জ লাইনগুলো যত
বাহির হইয়া আসে
গুহা হতে নির্ঝরের মতো।
পশ্চিম বঙ্গের কবি দেখিলাম মোর
বাঙালের মতো নাই জেদের অপ্রতিহত জোর

উদয়ন ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০।

কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে এটি লেখা হয়েছিল, তার নামটি বাদে এতৎসংক্রান্ত আর সব বিবরণই সেইসঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কবি এই নাম-বাদ পড়াটা লক্ষ্য করেন এবং যাতে এ রকম আর না ঘটে, তার জন্যে নাম বসিয়েই আর-একটি ছড়া তৈরি করেন। পূর্বের বাঙাল কবিতার সঙ্গে এটিকেও দিয়ে সর্বাঙ্গীন পরিচয়ে এবার ছড়াদুটি "রবীন্দ্র-দৈনিকী" নামক সুধাকান্ত বাবুর রচনায় প্রবাসীর ফাল্গুন সংখ্যায় (১৩৪৭) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ছড়াটি এইরূপ—

সুধীর বাঙাল গেল কোথায়
সুধীর বাঙাল কৈ?
সাতটা থেকে আমার মুখে
নেই কথা এই বৈ?

উদয়ন ১৬।১২।৪০ প্রাতে

সেদিনই আরেকটি ছড়া তৈরি হয়—

নাকের ডগা ঘসিয়া হাসে
দেয় না পষ্ট জবাব বাঙাল
কাজ করে সে ষোল আনার
খাতা এবং ছাপাখানার
মাঝখানে সে বাঁধে জাঙাল।

উদয়ন ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪০ সকাল।

এর পরে আরেকদিন আরো একটি ছড়া তৈরি করেন। সংকোচের কারণ থাকলেও, এগুলির মধ্য দিয়ে কবি-চরিত্রের একটি সহজ মধুর আভাস মিলবে মনে করেই এখানে এগুলি প্রসঙ্গত পরিবেশিত হল।

সুধীর যখন কর্ম করেন সু-ধীর করক্ষেপে
ধৈর্যহারা কবি যান যে ক্ষেপে।
রেগেমেগে কানুরামকে বলেন—"সুধীর কর-কে
বোলাও জলদি করকে।"
মাথা চুলকে বাঙাল যখন সামনে এসে দাঁড়ায়
তখন তাহার মুখের ভাবটা উষ্মা তাঁহার তাড়ায়॥

কানুরাম ছিল কবির তৎকালীন একটি বালক-পরিচারক, বহুপুরাতন ভৃত্য হিন্দুস্থানী ঝগড়ুর ছেলে। সুতরাং তার প্রতি সম্বোধনের স্থলে একদিকে যেমন হিন্দি আমেজ মিশিয়ে কবি কবিতাটিকে সরস করবার সুযোগ পেয়েছেন, তেমনি কর-কে'র সঙ্গে হিন্দি ক্রিয়াপদ 'করকে' দিয়ে মিলের চমৎকারিত্ব সৃষ্টির লোভটাও তাঁর কম ছিল না নিশ্চয়ই।

কবির উল্লিখিত ঐ উষ্মার একটি ছবি পাওয়া যাবে দ্বিতীয় সংস্করণ 'প্রহাসিনী' কাব্যের 'তুমি' ছড়াটিতে ; তবে তার সর্বাংশে লেখকের যোগ নেই। প্রথমদিকের অর্ধাংশ পর্যন্ত যেটুকু তার ভাগে পড়েছিল, প্রসঙ্গান্তরে পরে যথাস্থলে তার বিষয় জানা যাবে।

প্রথমোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে 'কর-মশায়' কথাটি রয়েছে। কবির টানাটানা সুমধুর শেষ-আহ্বানের ধ্বনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঐ শব্দটিতে।

কবির বৃদ্ধ পরিচারক বনমালী এই সম্বোধনটির প্রবর্তক। ঐ নামেই লেখককে সে ডাকত। কবি সেই ডাকটিকেই গৌরব দিয়েছিলেন তাঁর কণ্ঠে নিয়ে। সময়বিশেষে, নাম ছাড়াও ঐ শব্দটিকেই তিনি ব্যবহার করতেন সস্নেহ সম্বোধনে।

আশ্রম ছেড়ে যাবার আগের দিন বিকেলে লেখকের ডাক পড়ল। উদয়নের দোতলায় কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি কবি একটু ব্যস্ত। বনমালী আমার উপস্থিতি জানাল। এদিকে শায়িত ক্লান্ত রোগজীর্ণ দেহ কিন্তু চোখে-মুখে উদ্বেগ। কবি বললেন,—কর-মশায় এসেছ ? দেখো তো সে-কবিতাটি কোথায়। কোন্‌টা ?—সেই যে, কদিন আগে দেখেছি,—রাত্রির বর্ণনা দিয়ে লেখা,—অন্ধকার !—ঐরকম কী যেন ! পাণ্ডুলিপির খাতাগুলো ও ফাইল ইত্যাদি সব নিয়ে একে একে খুলে ধরলাম। পাতার পর পাতা উল্টে দেখে অস্বস্তি আরো গেল বেড়ে। কেবলি বলতে লাগলেন,—কোথায় গেল সেটা, সেই যে রাত্রির কথা আছে। সে রকম সম্ভবপর সব কবিতাই দেখানো হল।—

না না, এ সব নয়, এ সব নয়,—কী যেন গম্ভীর ভাবের একটা লেখা !—এই তো সেদিনই যেন দেখেছি ! খাতাপত্র নেড়েচেড়ে হতাশ হয়ে একটু এলিয়ে পড়লেন—'থাক্'। কবির রচনার হিসাব কবি নিজেই বরাবর একরূপ মনে রাখতেন, দপ্তরে সে-সব যে যত্ন করে রাখা হত, তা বলাই বাহুল্য, বিশেষত এই রোগ-শয্যার রচনাগুলো। এর গুরুত্ব সবাই তখন বুঝতে পারছেন—সব লেখাই সংগৃহীত ছিল। কিন্তু কবির মনে তখন কী যে খেলেছিল, তাঁর সেই রাত্রির কবিতা আর তাঁকে জুগিয়ে দেওয়া গেল না, তাঁর ব্যাকুলতার কাছে অক্ষমতার দুঃখবেদনা নিয়েই মৌনমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

নোটবইগুলি খুঁজে খুঁজে খাতার পাতা থেকে কবির বিস্মৃত, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত কয়েকটি কবিতার উদ্ধার করা চলছে। সেগুলো তাঁর কাছে এনে ধরে দিতে আনন্দের রেখা দেখা দিল পাণ্ডুর মুখে। মনে পড়ে, 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি ছিল এই শ্রেণীর উদ্ধার-করা কবিতার একটি। সেদিন এরূপ আরো দুটি কবিতা কবিকে দেখিয়ে নেওয়া হল।

কলকাতায় গিয়ে অস্ত্রোপচারের পর মৃত্যুর পূর্বে কবি শেষ যে-দুটি কবিতা মুখেমুখে বলে রচনা করে রেখে যান, রাত্রির কথা তাতে রয়েছে। মানসলোকে কবির শেষ কাব্যানুভূতির সূত্রপাত শান্তিনিকেতনে থাকতেই ঘটেছিল; তখন থেকেই যে ঐ ভাবচ্ছায়ার হাতছানিতে কবির মন গহনলোকে আনাগোনা শুরু করেছিল, সময়বিশেষে তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও স্মৃতির আশ্রয়ে রাত্রি-বিষয়ক কবিতার এই আকস্মিক সন্ধান-ব্যাকুলতার মধ্যে

তার আভাস মেলে। এই তথ্যটুকু হয় তো মনস্তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ 'গীতবিতান' ছাপা সম্পর্কে লেখককে লেখা আরেকখানি চিঠি এখানে প্রকাশ করা যাচ্ছে। অন্য আরো নানা-খবর এতে পাওয়া যাবে। এ গ্রন্থের মধ্যেই স্থানান্তরে সে-সব প্রসঙ্গ আছে। লিখছেন,—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গীতবিতানের প্রুফ দেখে দিলুম। ছাপাটায় যথাসম্ভব ঠাসবুনুনির দরকার, কারণ গানের বই সহজে বহন করবার যোগ্য হওয়া চাই, অকারণ ফাঁক বর্জনীয়। প্রত্যেক পর্যায়ের গান সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করতে বলেছি। ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের শিরোনামা দেওয়া সম্ভব হয়নি, অথচ ইঙ্গিতে তাদের ভিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। সংখ্যামালার পরিবর্তনে পর্যায়ের পরিবর্তন নীরবে নির্দিষ্ট হতে পারবে—ভাবুক লোকের পক্ষে সেই যথেষ্ট। পূজা অধ্যায়ে গানের পর্যায় শেষ হলে তার পরবর্তী পর্যায়ে নূতন করে এক দুই বসবে। সূচিতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ছেদ রেখে দেবে—এবং সংখ্যা ও বর্ণানুক্রমিক প্রথম লাইন থাকবে। বড়ো শিরোনামা হোলো পূজা,—ছোটো শিরোনামার দরকার নেই, কিন্তু তার স্বতন্ত্র সংখ্যা-ধারা চলবে। [আমার মনে হয় গানগুলো বর্ণানু-ক্রমিক ছাপা হলে সুবিধা হত— অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে। কিন্তু এখন সে চেষ্টা করে সময় নষ্ট অনাবশ্যক। সূচির উপর সেই ভার রইল]।* ছোটো বিভাগগুলোর নামকরণ যদি সম্ভব হয় তবে সে কাজে নন্দ-গোপালের সহায়তা নিতে পার। আমার ক্লান্ত বুদ্ধিতে কুলোল না।

* এই অংশটি কবি লিখেও কেটে দিয়েছেন।

পত্রধারার ভূমিকা লিখে কিশোরীকে পাঠিয়ে দিয়েছি, সেটা পেয়েছ কিনা জানিনে।...

চোখের দুর্বলতার জন্যে কোমর বেঁধে লিখতে বসতে পারছিনে —ছোটো অক্ষরের মহাভারত যেন কাঁকর বিছানো রাস্তা তার উপর দিয়ে চোখ চালানো আরামের নয়।

আগামী যে কবিতাগুলো পূজার বন্ধের পূর্বে ছাপাবার সঙ্কল্প আছে, তার নাম দিতে চাই সেঁজুতি—জানিনে শব্দটা পূর্বাঞ্চলে চলিত আছে কি না— কিন্তু সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।

আশ্রমে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়েছে শুনে মনটা ঠাণ্ডা হোলো।

একটা কথা বলে রাখি, অন্য সকল বইয়ের মধ্যে 'গীত-বিতানে'র দিকেই আমার মনটা সব চেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে —নতুন ধারায় ও একটা নতুন সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে।

ইতি ২৩ বৈশাখ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম সংস্করণ 'গীতবিতান' কবির নির্দেশিত শৃঙ্খলা রক্ষা করেই সংকলিত হয়। তাতে কালানুক্রমিক ও বর্ণানুক্রমিক দুটি সূচি যথাক্রমে গ্রন্থের প্রথমে ও শেষে সংযোজিত ছিল। গান খোঁজবার বেলা কবি দুটি সূচি ঘেঁটেও যখন কোনো কোনো গানের সন্ধান করে উঠতে পারতেন না, মহা বিরক্ত হতেন। ডাক পড়ত লেখকের, কারণ সেটাতে ছিল লেখকের সম্পাদনা। বিরক্তির ঝাঁজ দিয়ে বলতেন,—জবড়জঙ্ একটা সিন্ধুক বানিয়েছ। মাথামুণ্ড কিছুই খুঁজে পাওয়ার জো নেই। বের করে দাও, দেখি কোথায় পাও তুমি। নিশ্চয়ই এটা বইয়েতে

বাদ গেছে। বুক কাঁপত, কিন্তু ভাগ্যগুণে প্রায়বারই গানটা বের করে দিয়ে উদ্ধার পেতুম। প্রথম পঙক্তির প্রথম শব্দটি ধরেই বর্ণানুক্রমিক সূচিতে গান বসানো ছিল। কোন্ শব্দটি দিয়ে শুরু হয়েছে, সময় সময় পাঠান্তরের দরুন, গানের সেই প্রথম শব্দ নির্ণয়ের গোলযোগেই আসলে ঘটত এই বিভ্রাট। যাহোক, কবি এই বাহ্য কারণটিকে উপলক্ষ করে কেবলি বলতেন,—এই বই দিয়ে আমার চলবে না, নূতন বই ছাপাতে হবে। অথচ ভিতরে ভিতরে চলছে তখন তাঁর অন্য কারণের তাগিদ। দ্বিতীয় চিঠিখানির শেষদিকেই সে তাগিদের কথা প্রকাশ পেয়েছে। *স্বরলিপির বইগুলোতে তো গানের সুরবাহন সংগীত-রূপ রয়েইছে ; এখানে সংকলন-কলার দ্বারা গানগুলোর কাব্যরূপকে মুখ্য করে তুলে 'গীতবিতান'-গ্রন্থের মধ্যে তা ফুটিয়ে সাহিত্যের আসরে ধরা চাই*—এই হচ্ছে কবির তখনকার সেই ভিতরের তাগিদ। 'গীতবিতান' দ্বিতীয় সংস্করণে কবির লেখা ভূমিকা দেখলেই একথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ব্যবস্থাপকদের তা বুঝতে বাকি ছিল না। কারণ কবির এইপ্রকার সময়বিশেষে বিশেষ ভঙির উষ্মার তাৎপর্য তাঁদের জানাই ছিল।

নূতন সংস্করণ ছাপা শুরু হল! গানগুলোর বিষয় ভাগ করা এবং বিষয়ানুসারে অনুবিভাগ করা নিয়ে বারবার দু-হাজার গানের খুঁটিনাটি বিচার করে কত রকম ঢালাই-সাজাই করে দেখা,—এতে যে কী পরিশ্রম! দিনের পর দিন সকালবেলায় বাঁধা সময় করে সব ঝক্কিটা একরকম তিনি নিজেই পুইয়ে

গেলেন। ব্যাপারটা তাঁর কত আগ্রহের ছিল তা পত্রেই বোঝাচ্ছে ; বিলম্ব ঘটুক, তবু তিনি ঐরূপ একটি বিরাট ব্যাপার ঐ বয়সে নিজের হাতে সম্পাদন করে গেছেন। তাই না আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে, আমরা পেয়েছি কবির হাতের তৈরি বর্তমান 'গীতবিতান'। উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণে ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা হয়নি বটে কিন্তু বিষয়বিভাগ করা রয়েছে। কবির পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগের ছাপযুক্ত একটি বিশেষ সংস্করণের মতো মূল্যবান জিনিসের লাভটা আমাদের কম নয়। অবশ্য ছাপাবার বেলা দু-চারটি গানের বিষয়বিভাগে ঐ সংস্করণে আমার ভুল ঘটেছিল, কয়েকটি গান বাদও পড়েছিল একথাও বলা আবশ্যক। তখন কিশোরীমোহন সাঁতরা ছিলেন গ্রন্থবিভাগের সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ছিলেন কবির দপ্তরে অন্যতম সহকারী। অবশ্য এক্ষেত্রে নন্দবাবুর সাহায্যের আর দরকার পড়েনি, কবি নিজেই ক্লান্তবুদ্ধির (!) পরিচয় দিয়ে সে কাজ সম্পাদন করেছিলেন। এরূপ 'ক্লান্তবুদ্ধি'র পরিচয় তাঁর অনেকই আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি তার পরিচয় দেবেন। বিধাতা তাঁকে বড়ো করেছিলেন, কেবল প্রতিভায় নয়, পরিশ্রমেও—এমন কি কৃচ্ছ্রতায়ও, সে-কথাই কেবল এক্ষেত্রে আরো তখন মনে হয়েছে।

সমস্ত দেশে গোটা বৈশাখই চলে কবির জন্মোৎসব। সকলে নানাভাবে কবিকে অর্ঘ্য দিয়ে থাকে। সকলকে প্রতিদানে কিছু না দিয়ে কিন্তু কবির শুধু নিতে মন ওঠে না। কবির একটি বিশেষ আগ্রহ থাকত নববর্ষের দিন বা পঁচিশে

বৈশাখের বিশেষ দিনটি উপলক্ষে একখানি নূতন বই বের করার। এমনিতেই শেষদিকে এক-এক বছর একাধিক বই শুধু কবিতারই বেরিয়েছে। সেবার আশি বছরের জন্মোৎসব। গোটা বছরে বই কিছু বেরয়নি। যা জমা ছিল, সমস্ত কবিতা দিয়ে একখানি নূতন কাব্য বের করাই স্থির হল। ভাণ্ডার শূন্য পড়লেই নূতন জোগানের তাগিদ আসত কবির মনে, দেখা দিত তাঁর সৃষ্টির নূতন চালান, অনেক সময় সেইসঙ্গে নূতন 'চাল'ও। জমানো সব বের করে দিতে গিয়ে, যত সব ভাবগম্ভীর বিশেষ ধারার কবিতার সঙ্গে চলে গেল সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে টুকরোটাক্‌রা খুচরা কবিতাও। দুটো বইয়ের কবিতা নিয়ে দাঁড়াল একটা বই। হল সেটা স্তূপাকার এবং জবড়জঙ্। কবির নির্দেশ!—পাঠানো গেল তাই প্রেসে। নববর্ষে কিছু দেবার নিয়ম রক্ষা হবে বটে, কিন্তু কবির মন ভারাক্রান্ত জিনিসগুলোর অসংগতির ভারে। ঘটনাচক্রে সেইদিনই এসে পড়েছেন অমিয়বাবু। কবির নির্ভরযোগ্য শ্রোতা ছিলেন তিনি। কবি কপিটা প্রেস থেকে আনিয়ে নিলেন। সেদিন এ পর্যন্তই। পরদিন সকালে অফিসে আসতেই দেখা গেল আবহাওয়ার অদ্ভুত বদল। রাত্রে যেন কবির উপর দিয়ে এক ঝড় বয়ে গেছে,— আসছে আরেক ঝড়। কথাবার্তা একরূপ বন্ধ। সব গুরুগম্ভীর থমথমে। কবিতার ফাইলটি এল ফেরত। ডাকিয়ে নিয়ে জানালেন, সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা কবিতার আপাতত বিদায়। যা থাকল, দুটো কবিতার বই হবে তা দিয়ে। বাদ-পড়া কবিতার স্থান পুরাতে হবে, এজন্য এখনই

লিখতে বসতে হবে, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। বললেন,—একটাতে সব ঠাসলে খুবই ক্ষতি হত, সেই 'পরিশেষে'র মতো ভালোগুলো পড়ত চাপা। অমিয়র কথাই ঠিক, দুটো বই হওয়াই ভালো। এর পরে যেমন ধ্যানে বসেন, তেমনি করে বসলেন লিখতে। দুটো বইর সিদ্ধান্ত তো হল। কিন্তু সে পরিমাণে দুটোতেই কবিতার সংখ্যায় পড়ল কিছু কম্‌তি। নূতন লিখে এর মধ্যে তা আর ছাপিয়ে ওঠা যাবে কি না সে থাকল এক বিষম উদ্বেগ। কিন্তু সেই বৈশাখেই বের করলেন 'নবজাতক', আষাঢ়ে বেরল বাকিগুলো দিয়ে 'সানাই'। দুই বইতেই নূতন কবিতাগুলো ভাগ হয়ে গেল। ব্যক্তি ও ঘটনার সেই খুচরা কবিতগুলো রইল পড়েই। আজ যে দুটি চমৎকার কাব্য পড়া যাচ্ছে তার গোড়ায় অমিয়বাবুর সমঝদারিতা এইভাবে কিছুটা কাজ করেছে। অন্তত পাঁচমিশেলি বস্তাবোঝাই মালের আমদানিতে শেষকালে সাহিত্যের পথ-জোড়ার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেছেন তিনি রবীন্দ্র-কাব্যকে। এজন্যে তিনি নিশ্চয়ই সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন, সন্দেহ নেই। কিরূপ সঙ্গীন মুহূর্তে সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়ে, নূতন লেখায় নূতন দুটি সৃষ্টিকে সম্ভব করেছিলেন সৃষ্টিকুশলী তড়িৎ লিপিচালনায়, কবির সে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় শেষদিকেও এই একবার দেখা গিয়েছিল।

কবির রচনার প্রথম প্রকাশ অধিকাংশ সময়েই ঘটেছে প্রবাসীতে। রচনার প্রথম ছাপা প্রবাসীর পাতায় দেখতেই ছিলেন তিনি কৌতূহলী। শেষকালে রচনার মাসিক কিস্তি একরূপ বাঁধা

পাওনাতেই প্রবাসী অফিসের কায়েম হয়ে গিয়েছিল। গল্প 'বদনাম' গেল প্রবাসীতে। তখন কবির আর নিজের হাতে কলম নেই। বলে যান, লিখে নেন অন্যে। সাধারণত তা শ্রীমতী রাণী চন্দই বেশি লিখতেন। পরাধীন বার্ধক্যের শিথিল প্রযত্নতার সংশয় লেগেছে কবির মনে। 'বদনামে' লেখার মান সম্বন্ধে বদনামের ভয় কেবলি মনে দিচ্ছে উঁকি। আর প্লটে নূতন নূতন বাস্তব-ছোঁয়া ঘটনার জোড় লাগিয়ে তার জোর বাড়াচ্ছেন। নূতন কপি পুনরায় প্রেরিত হচ্ছে প্রবাসীতে। রামানন্দবাবুকে লিখছেন,—ভালো না লাগলে ছাপাবেন না। প্রতিদিন ডাক দেখা হচ্ছে, কিন্তু রামানন্দ বাবুর সাড়া নেই। কবি তখন ধরে নিয়েছেন লেখাটা সম্পাদকের পছন্দ হয়নি, কেবল রবীন্দ্রনাথ বলেই এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় চিরাচরিত নিয়ম-পালনে বেধেছে তাঁর ভদ্রতায়। নিশ্চয়ই উভয় সংকটে পড়েছেন রামানন্দবাবু। লিখলেন,—কিছু মনে করবার কারণ নেই, লেখাটা তাড়াতাড়িতে সারা হয়েছিল, ওতে আরো অনেক পরিবর্তনের আছে,—ফেরৎ পাঠালেই ভালো হয়। চিঠি যাবার আগেই কিন্তু প্রুফ সহ রামানন্দ বাবুর পত্র এসে হাজির। তাতে ওদিক থেকে তাঁর অনুযোগ এল যে, ভালো হয়নি এটাই কবির ধরে নেবার কারণ কী। তিনি যে ওদিকে অপেক্ষা করছেন শেষ-পাঠটির জন্য, যাতে শেষ-প্রুফটা একবার দেখেই কবির শ্রমলাঘব হয়। এটা তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, কবি যেন কিছু মনে না করেন। লেখাটি সেবারে বের হবার মতো স্থান ও সময় ছিল না, কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করে সেই মাসেই রামানন্দবাবু বের

করেছিলেন। কবি তাঁর সেই শ্রদ্ধার আগ্রহ অনুভব করে প্রীত হয়েছিলেন।

সত্তর বছরের জয়ন্তী। কলকাতা মহানগরীতে উৎসবের বান ডেকেছে। কবিকে প্রাণ ঢেলে দিয়ে লোকে কৃতার্থ হবে,—এই উৎসাহ চারিদিকে। দীর্ঘ অভিভাষণ ছাপিয়ে নিয়ে গেলেন কবি শান্তিনিকেতন থেকে। কলকাতা গিয়ে জানলেন, পৌরসভায় বিরাট জনতার সমাবেশ হবে। তার মধ্যে আছে অনেক রকম অনুষ্ঠান; দীর্ঘ কিছু পড়ে ওঠা অসম্ভব। কবি বিকেল চারটায় যাবেন সভাস্থলে। টাউনহল প্রাঙ্গণে হয়েছে সভার আয়োজন। দেশ বিদেশ থেকে মনীষীর মেলা। সকলের মনের মতো কথা বলতে হবে, কবির মান রাখতে হবে, কিন্তু ভাষণটি বড় হলে হবে না, গুণেও কমতি হলে চলবে না। সভায় যাবার জন্য কবি তৈরী হয়েছেন,—চা খেয়ে নিচ্ছেন। বাড়ির লোক এবং শান্তিনিকেতনের সবাই বেরিয়ে গেছে। সভায় স্থান সংগ্রহ করতে হবে। গাড়ি তৈরী। কবি চায়ের টেবিলে বসে। কলম নিলেন তুলে। শুরু হল লেখা। চারিদিকে তাড়াহুড়ো, কয়েক মিনিট মাত্র সময়, লিখে ফেললেন জয়ন্তী ভাষণ। পড়লেন সভায়। বড়ো যে লেখাটি ছাপিয়ে নিয়েছিলেন, সেটির গতি হল সিনেট হলে,—ছাত্র-সংসদে। জয়ন্তীর বৃহৎ জনতার সাড়া কবির মনে ঢেউ তুলেছিল। চলতি মুখে লেখা একপাতার ভাষণে তা প্রকাশ পেয়েছে।

শেষ বয়সেও রচনার সঙ্গে রচনাসমাপ্তির তারিখ দেওয়া কবির পছন্দ হত না, আবার তা না দেওয়ার জন্যেও সময় সময়

অনুলিপিকারককে বকুনি খেতে হয়েছে। কোনো কোনো স্থলে কবি ভুল করে ভুল তারিখও বসিয়ে রাখতেন।

সন-তারিখ যোগে কোনো কবি-জীবনী রচনার বা ইতিহাসের ভিত্তিতে সাহিত্যের মূল্যবিচারের উপযোগিতা কবির কাছে তেমন গুরুত্বলাভ করেনি।

মাঝে মাঝে ভুল তারিখ দেওয়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে, কবি রগড় করে বলতেন,—থাকুক না গল্‌তি ; একেবারে সবই ঠিকঠাক করে রেখে গেলে পরবর্তী প্রভাতকুমারদের দলের ('রবীন্দ্র-জীবনী'-কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশায়কে উদ্দেশ করে বলা) দিন কাটবে কী নিয়ে ? আমি তো বেশ এখনই দেখছি, হাট কী রকম জমে উঠেছে। ওঁদের জাতের সব লেগেছে একটা লেখা, একটা খবর, একটা তারিখের পিছনে। কত গবেষণা, কত প্রবন্ধনিবন্ধ, পুঁথিপত্র, কত তর্ক-বিতর্কের ছড়াছড়ি ! মাঝে মাঝে দমে গিয়ে হঠাৎ দেশটা গমগম করছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কিছু যদি হয়রান হয় তো হোক না, গোলকধাঁধার পাকে পড়ে কত রবীন্দ্রনাথকেই না সেদিন ওঁরা দেখতে পাবে। সে কি এই একজনই ?—আর, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে ওঁদের হাল দেখে ওদিকে তখন কী মজাই না লুটছে, তা বেচারারা জানতেই পাবে না। এই ভেবেই তো মরতে আর দুঃখ নেই।

ঠাট্টা নয়, বেঁচে থাকতেই কবি একটি নমুনা দেখে গেছেন। কিছুদিন আগে 'একসূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি প্রাণ' গানটি নিয়েই নানাসূত্রে যে টানাপোড়েন চলেছিল, কবি তা দেখে

যাননি। কিন্তু 'ভানুসিংহের পদাবলী' নিয়ে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় থিসিস্ লিখলেন,—জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডাক্তার' ডিগ্রিও পেলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে এ খবর কবিই দিয়েছেন।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থসচিব শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় কবির 'রচনাবলী' প্রকাশে উদ্যোগী হন। একাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন কিশোরীমোহন সাঁতরা। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বেকার রচনা এবং আরো অনেক রচনাংশ—কবি যা কাঁচা রচনা হিসাবে বাদ দিয়ে রেখেছিলেন,—'রচনাবলী'তে চারুবাবু সে-সবই ছাপাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক সূত্রস্বরূপ এবং সাহিত্যিক মূল্যে সার্থক রচনা হিসাবে তার অনেকগুলোর ক্রম রক্ষা করা হবে। কবি বিরোধী হলেন। শেষ পর্যন্ত চারুবাবুর আগ্রহ এবং তাঁর যৌক্তিকতার কাছে তিনি নিরস্ত হন। কিন্তু 'অবর্জিত' নামক একটি কবিতা লিখে তার মধ্যে নিলেন এক হাত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস ভক্তদের। এই কবিতা-কটাক্ষের লক্ষ্যীভূত ছিলেন কবির প্রীতিভাজন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তিনিই রবীন্দ্রনাথের অপ্রচলিত রচনা-সংগ্রহে প্রথম ব্রতী হয়েছিলেন। দুখণ্ডে অচলিত সংগ্রহ 'রচনাবলী'র অংশ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাস কবিকে ছাড়েনি।

প্রায় এই সময়েই শ্রীসজনীকান্ত দাস কবির কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য লেখা এবং কবি-জীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট তথ্যের সত্য নির্ণয় করে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য 'রচনাবলী'র নেপথ্যবিহারী সম্পাদকমণ্ডলীর পুরোধা শ্রীপুলিনবিহারী

সেনের নানা তথ্য ও পাঠ জিজ্ঞাসা বরাবর লেগেই ছিল। কবি এঁদের দুয়ের আগ্রহই সন্তোষের সহিত লক্ষ্য করতেন।

'রচনাবলী' নিয়ে একটি পরিহাস কবির মুখে লেগেই ছিল। বলতেন,—'রচনাবলী' তো নয়, ও হচ্ছে 'রচনা বলি'। নেপথ্যের আব্রু ভেঙে অতঃপর সব লেখাই ঐতিহাসিক দাবিতে সংকলন করবেন—কর্তৃপক্ষের এই ছিল অপরাধ। এদিকে 'রচনাবলী'র অন্তর্গত বইগুলোর সূচনা লিখতে তাঁর বিরাম ছিল না। প্রুফও কয়েক ফর্মা নিজেই দেখেছেন। তাঁর কাছে প্রুফ গেলে কী যে কখন্ বদল হবে, তার ঠিক ছিল না। শান্তিনিকেতনে প্রেসের লোকদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নূতন বই হলে কথাই ছিল না, কেবলি চলত অদল বদল। বেশি পুরানো বইতে পরিবর্তন ঘটত কম।

'পঞ্চভূত' ছাপা হচ্ছে; অনেকদিন পর নূতন সংস্করণ হবে। কবি নিজে একটি প্রুফ দেখতে চাইলেন। মেয়েদের আলোচনার অংশে এসে দাঁড়ালো এক বিপর্যয়। তাঁরই জানা উচ্চ শিক্ষিতা একটি মেয়ে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন, ভালোবেসেছিলেন একজনকে। তাঁর ভালোবাসার দায়ে পুরুষটির উন্নতির পথ ব্যাহত হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তাঁকে বিয়ে করলেন না। কবি ঘটনা জেনে মর্মাহত হয়েছিলেন। রেগে গিয়ে বলেছিলেন,—সংসারে পুরুষদেরই অপবাদ—মেয়েদের তারা ডোবায়। কিন্তু কত মেয়ে যে পুরুষদের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়েছে, ভালোবাসার উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, তার খবর কে রাখে!

এই বলে আটকে রাখলেন প্রুফ। তাতে যোগ হল নূতন এক অধ্যায়, মেয়েদের উপর কড়া মন্তব্য নিয়ে।

প্রেসের অসুবিধার কথা নিজেই অনেক সময় বুঝতেন। মেক-আপে যাতে হাঙ্গামা না বাড়ে তার জন্য যতটুকু অংশ বাদ দিতেন, সেই মাপেই নূতন অংশকে সংহত করে ফেলতেন। 'বাঁশরী' নাটকটি ছাপা হচ্ছে। প্রুফে দেখলেন 'পৃথ্বীশ' শব্দটির 'থ' এবং তার তলাকার 'ব' ফাঁক হয়ে থাকে, দেখতে সুশ্রী হয় না। অগত্যা নায়কের আদি নামটিই দিলেন বদলে। অর্থ একই রইল। করলেন 'ক্ষিতীশ'।

পাছে লোকে ভুল বোঝে, এজন্যে কতকগুলি শব্দকে কবি কপিতেই বিশেষ বানানে লিখতে বলতেন। ছাপানোর বেলাও সেই সতর্কতা। 'নাড়ি' ক্রিয়ার সঙ্গে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, এজন্যে নির্দেশ ছিল অন্ত্র অর্থে দীর্ঘ ঈকার যোগে 'নাড়ী' লেখার। তেমনি 'মত' শব্দের বেলা; অভিমত-এর সঙ্গে পার্থক্য রাখা দরকার। সদৃশ অর্থে তাঁর প্রয়োগ ছিল ও-কার যোগে 'মতো'র। ঐ ছিল কবির এক খুঁতখুঁতে ভাব। 'সাথে' শব্দটির গদ্যে প্রয়োগ তিনি বরদাস্ত করতে পরতেন না। ওটাকে নবীন লেখকদের হাতে প্রাদেশিকতার আমদানি হিসাবে দেখতেন। 'ঙ' ও 'গ'-এর যুক্ত অক্ষরের পরিবর্তে তিনি স্থানবিশেষে ব্যবহার করতেন শুধু ঙ, যেমন 'রঙ্গিন' স্থলে লিখতেন 'রঙিন'। 'যাদু' কেটে 'জাদু' লিখতেন, 'ওপর' স্থলে 'উপর', 'ভেতর' নয় 'ভিতর'।

কবির রচনার অভ্যাস সম্বন্ধে কবি একস্থানে লিখেছেন,

—ঋতু অনুসারে মনের সচেষ্টতা ও নিশ্চেষ্টতা হয়তো ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্নতা লাভ করে। আমি জানি কাব্য, গান প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু আমার পক্ষে অনুকূল। সম্ভবতঃ গ্রীষ্ম অন্যের পক্ষে বাধাজনক হোতে পারে। শীতের সময়ে আমার অন্য কাজে উৎসাহ হয়, গদ্য প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা দেওয়া তখন আমার পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু রস-সাহিত্য রচনার উৎসাহ সে সময়ে দুর্বল থাকে। বোধ হয় এই কারণেই আমেরিকায় ইংলণ্ডে আমি বক্তৃতা প্রভৃতি লিখেছি কিন্তু কখনো কাব্য লিখিনি, লেখবার ইচ্ছা মনেও উদিত হয়নি।

—'মনোবিকাশের ছন্দ' প্রবন্ধ

কিন্তু, অন্যত্র আবার এও লিখেছেন,—'চিত্রাঙ্গদা' ছাড়া আমার আর সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতি-কাব্যের আবেগ অনেক ঠাণ্ডা হয়ে আসে, অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়। —ছিন্নপত্র পৃঃ ১৫

সাহিত্যরচনা প্রসঙ্গে কবি বলতেন,—কল্পনাই সাহিত্যিকের মূলধন, বিশেষত কবি ও কথাসাহিত্যিকের ক্ষেত্রে। ইংরেজি শব্দটি ব্যবহার করে বলতেন—ইমেজিনেশন (imagination) চাই গোড়ায়। সৃষ্টির সেই তো বীজ। অথচ বাস্তব বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞানচর্চায় দিতেন বিশেষ জোর। বিজ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া সাহিত্য আগামীকালে হবে একান্তই অচল। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যুক্ত-গতিই এখন যুগধর্ম। শুধু আবেগ নিয়ে থাকলে ভাবালুতা জন্মে, তাতে রচনা দুর্বল হবার সম্ভাবনাই বেশি, শাঁসালো না হয়ে লেখা

হয় জোলো। এজন্যে সাহিত্যিকেরও পক্ষে এখন বিজ্ঞানের যোগ কিছু-না-কিছু দরকারই। শেষদিকে কবির কাব্যগুলিতে পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রভাব এসে গেছে এবং এসেছে তা কবির সজ্ঞান সচেষ্টতা থেকে।

বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অনুরাগ-উদ্যম শুধু মৌখিক নয়; দেশের উন্নতির পক্ষে তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল বিজ্ঞান। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই ভিতর বৈজ্ঞানিক মন গড়ে তোলবার জন্যে অব্যবসায়ী হয়েও 'বিশ্বপরিচয়' বই লিখেছেন, তার জন্যে পড়াশুনায় পরিশ্রম করেছেন শেষ বয়সে যথেষ্ট। বই লিখিয়েছেন আশ্রমের অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে দিয়ে এবং শেষদিকে অধ্যাপক প্রমথ সেনগুপ্তকে দিয়ে। আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণী থেকে 'পর্যবেক্ষণ'কে করেছেন শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এবং শেষকালে কলেজ-বিভাগে করেছেন বিজ্ঞানশ্রেণীর ব্যবস্থা। উত্তরায়ণে অনুষ্ঠিত আশ্রম-ছাত্রদের একটি সাহিত্যসভায় তিনি তাদের বেশি করে মননশীল হতে বলেছিলেন। সংসারের বাস্তব সমস্যা ও সমাধানের চিন্তায় একেবারে উদাসীন থাকা ছাত্রদের বিদ্বৎমনের পক্ষে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। ছাত্রদের কাছে তিনি চেয়েছিলেন বাস্তব জ্ঞানে ঔৎসুক্য, দেশের তথ্য-সংগ্রহে নিষ্ঠা।

তাঁর বিবেচনায় দেশের উন্নতির মূল নিহিত জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনে। প্রাথমিক শিক্ষা না হলে, সাহিত্যই কী, আর বিজ্ঞানই কী, কিছুই বুঝবে না লোকে, সেজন্যে লোকশিক্ষা বিস্তারের নানা উপায় প্রবর্তনে তিনি সচেষ্ট

ছিলেন। বড়োদের জন্যে অর্থাৎ শিক্ষিত-সাধারণের জন্যে 'বিশ্ববিদ্যা-গ্রন্থমালা' পরিকল্পনাটির সঙ্গে 'লোকশিক্ষা সংসদে'র গ্রন্থপ্রকাশ পরিকল্পনাকে আজ বিশ্বভারতী রূপ দিয়েছে কাজে। কবি বেঁচে থাকতে এখনকার 'লোকশিক্ষা সংসদে'র কাজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে। তাঁরই দেওয়া ঐ 'লোকশিক্ষা সংসদ' নামেই শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে-প্রতিষ্ঠান। অনুষ্ঠান-পত্রটিও তার ছাপানো হয়েছিল একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে। তখন চারপাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিয়ে ক্ষুদ্র চেষ্টা ছিল সীমাবদ্ধ। অনুষ্ঠান-পত্রটির মলাটের ভিতরের দিকে প্রথমেই কবির একটি বাণী মুদ্রিত ছিল। বিশেষভাবে এই সম্পর্কেই সাধারণের জন্যে সেই বাণীটি তিনি লিখে দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান-পত্রের সঙ্গে সেটিও এখন সমানই দুর্লভ হয়ে আছে। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে জনশিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণে যা বলেছিলেন তাঁরই সার-সংকলন ছিল ঐ বাণীতে। কালীমোহন ঘোষ মশায়ের প্যালেষ্টাইন থেকে ফেরবার বছর একাজটি শুরু হয়েছিল। অনুষ্ঠান-পত্রটি পেলে দেখা যেত, তার মধ্যে অনুষ্ঠান পরিচালনার খুঁটিনাটি পর্যন্ত দেওয়া আছে, পাঠ্য-পুস্তক, তালিকা, শিক্ষামান, দৈনিক শৃঙ্খলা,—সব কিছুই।

এক সময়ে কথা হয়, বিশুদ্ধ সুরের সংরক্ষণ ও বিস্তারকল্পে কবি-নির্বাচিত চার শ' গান কবিরই অনুমোদিত গায়কগায়িকা-দ্বারা গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রেকর্ড করিয়ে রাখা হবে। জনপ্রিয়তা, বিষয়, সুরবৈচিত্র্য, মাধুর্য, বৈশিষ্ট্য ও কাব্যগুণের

দিক থেকে বিশদ বিবেচনা করে সে-সঙ্গে নিজের রুচিও যোগ করে কবি ঐ চার শ' গান বেছে দেন। পরে অবশ্য সে পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়নি। কিন্তু তালিকাটি রচিত হয় ঐ উপলক্ষেই। আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের কালোত্তর ব্যক্তিদের কণ্ঠ রেকর্ড করে তা মাটির তলার সুদূর গর্ভে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করছিলেন শতাব্দীপারের বিশ্ববাসীর জন্যে। কবির কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তাঁর কণ্ঠও সেখানে গানে, কবিতায়, ভাষণে অবিকৃতভাবে রেকর্ডে রক্ষিত আছে আজ ঐ ব্যবস্থাতেই।

বাংলা-সাহিত্যের দুটি সংকলনের কাজ কবি হাতে নিয়েছিলেন। 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' প্রকাশ করে তার একটির পরিচয় রেখে গেছেন নিজেই। সেভাবে গদ্যসংকলনের কাজটিও করা হয়ে গিয়েছিল। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এ কাজে কবির সহকারী ছিলেন। কবি এটি প্রকাশ করে যেতে পারেননি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে একটি সংকলনও কবির তৈরী করা ছিল। তা-ও আছে অপ্রকাশিত। রবীন্দ্র-কাব্য থেকে প্রেমের কবিতার সংকলনও একটি প্রকাশ করার কথা হয়েছিল। 'মহুয়া' কাব্যের সূচনায় তার উল্লেখ আছে। সংকলনটির নাম ছিল 'রাখী'। এগুলো সবই রবীন্দ্র-ভবনে থাকবার কথা।

গদ্য-সংকলনের সময়ে, প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগের শরৎকুমারী চৌধুরাণী লিখিত 'শুভবিবাহ' এবং সেই সঙ্গে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'

নামক বই দুখানির কথা কবির মুখে বিশেষ করে শোনা গিয়েছিল। সাহিত্যরস যুগিয়ে এককালে শেষোক্ত বইখানি কবির মনোহরণ করেছিল। বলেছিলেন,—এখন আর বইখানি দেখতে পাইনে, তখন আমরা খুব পড়তাম।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কথা যেমন বলেছেন, মানুষের কথাও বলেছেন তেমনি। অনেক মানুষ আছে তাঁর জানা, দেখা, অনেক আছে কল্পিত। জেনেছেন তিনি পড়ে বা শুনে, দেখেছেন নিজের চোখে। কল্পনা এসেছে অনেকটা এ-দুয়ের যোগে, এসেছে তাঁর সৃষ্টিপ্রবণ মন থেকে। সেই মন-গড়া লোকেরা স্থান পেয়েছে প্রধানত গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে। আর পরিচিত লোকদের কথা পাওয়া যায় আত্মজীবনী, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী বা চিঠিপত্রে।

কবি জানা এবং দেখা লোকদের অনেকের কথা পূর্বে থেকেই বলবেন স্থির করে বলেছেন; কিন্তু অন্য নানা গল্প করতে গিয়ে গল্পের মুখে অগোচরে এসে গেছে যাদের কথা, তারা পটের ছবির মূল চিত্র নয়, চিত্রের মধ্যে তারা নেপথ্যের উঁকিমারা মুখ, আনাচ-কানাচ থেকে আভাসিত মাত্র। তারা গৌণ বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনকাব্যে কবিকর্তৃক উপেক্ষিত নয়, বলা যায় উপলক্ষিত। এরাও নিজেদের স্বীকৃতি পেয়েছে; কবি এদের কথা ভোলেননি, উল্লেখ করেছেন নানা প্রসঙ্গে। চরিত্রে যারা সুন্দর, এমন কয়েকটি উপলক্ষিত দলের মানুষের গল্প আছে। 'যাত্রী' গ্রন্থে তিলক মহারাজ, বৈষ্ণবী, জার্মান বৈজ্ঞানিক এবং জাভার সামুয়েল কোপেরবার্গ—এই চারটি চরিত্র

নেওয়া যায় তার নমুনা হিসাবে। গুরুগম্ভীর বিষয়ের ফাঁকে ফাঁকে আছে এই গৌণ গল্পগুলি যা বইখানিকে সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য করে তুলেছে।

তিলক মহারাজ কবিকে একসময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন ভারতের কথা বিদেশে প্রচারের জন্য। দেশের কাজের টাকা বলে কবি তা নিতে চাননি। তিলক বলেছিলেন,—কবি যা বলবেন, তাতেই হবে দেশের কাজ। কবি সে টাকা নেননি। কিন্তু ঘটনাটি বলে রাজনীতিক তিলকের একটি মহান দিক তিনি এঁকেছেন, আর কোথাও এ-পরিচয় নেই।

বৈষ্ণবীর কথাগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটেছে নিরাসক্ত সরস মানুষের মন। এই বৈষ্ণবী শিলাইদহের বৈষ্ণবী, 'গল্প সপ্তকের' বৈষ্ণবী, বাস্তব মানুষ।

জার্মান বৈজ্ঞানিক দম্পতির সঙ্গে কবির দেখা হয় য়ুরোপ থেকে ফিরবার পথে স্টীমারে। তাঁরা মধ্য ভারতের অরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে, দুবৎসর তাদের মধ্যে বাস করে, তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন করে জানতে চান। এরই জন্যে তাঁরা দুজনে প্রাণপণ করতে কুণ্ঠিত হননি। মানুষ সম্বন্ধে আরো জানতে হবে, সেই আরো-জানা বর্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। মানব প্রেমিক বিজ্ঞানী য়ুরোপের এমনি মানুষের গল্প এতে ধরা পড়েছে। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের সাত নম্বর পত্রের শেষাংশে এই বিজ্ঞানীর কথা

আরেকবার উল্লিখিত হয়েছে। এদের মাহাত্ম্য ভিতরে ভিতরে কবিকে এতই আকৃষ্ট করেছিল।

কবি একজন সামাজিক লোকের গল্প করেছেন জাভার সামুয়েল কোপেরবার্গকে নিয়ে। গল্পটির সমাপ্তির দিকে কবি বলেছেন,—তিনি মানুষটিকে ভালোবেসেছেন। একথা বলেছেন মানুষটির সাহচর্য ও প্রত্যক্ষ সেবা পেয়ে। তাঁর পক্ষে এ-রকম বলাটা সহজই ছিল বলতে হবে, কেননা সে-সব সেবা-যত্ন কিছু না পেয়ে, ভদ্রলোকটিকে চাক্ষুষ না দেখেও পাঠকের পক্ষে তাঁকে ভালো না বেসে থাকা কঠিন। এমনিই তাঁর সহজ হৃদ্যতা, সুচারু ব্যবহার। কবির লেখা লোকটিকে জীবন্ত করে তুলে আমাদের কাছে এনে দিয়েছে।

উল্লিখিত মানুষদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, খ্যাত আছে, আছে অখ্যাতও। কিন্তু খ্যাতি-অখ্যাতির অপেক্ষা নেই। এদের বিশেষ পরিচয়টি কবির কাছে কবিরই নিজস্ব রুচি ও দৃষ্টিতে আবিষ্কৃত। রবীন্দ্র-জীবনীতে এরা কবি-পারিপার্শ্বিকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

এদের কথা কবির লেখাতে আছে। কিন্তু যাদের কথা তাঁর কোনো লেখায় নেই, স্মৃতিতেও নিখোঁজ, অথচ যারা পথচল্‌তি মুখে কবির হৃদয়কোণ কোনো এক মুহূর্তে অধিকার করেছিল, তাদের পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতিই মানুষের এবং সাহিত্যের পক্ষে সত্যিকার ক্ষতি। কবির সঙ্গেই তাদের কথা কালের তলায় তলিয়ে গেছে। বাইরে যদি বা থাকে, কচিৎ কোনো মৌখিক গল্পে তারা কিংবদন্তী আকার পাবে মাত্র। কিন্তু

প্রমাণের অভাবে হয়তো শ্রোতার কাছে পাবে তারা অবিশ্বাসের অবহেলা। সেই দুর্দৈবাশঙ্কা করেই তাদের কথা বলতে বাধে। কিন্তু না বললেও কবির মানব-রসগ্রাহিতার একটি পরিচয় থাকে ঢাকা। একটু ছায়াও যদি পাওয়া যায়, মন্দ কী! একটি ঘটনা বলা যাচ্ছে।

সময়টার সঠিক তারিখ নির্দেশ করা কঠিন। সত্তরের কোঠায় কবি দেহ-মনে একটু শিথিল হয়ে পড়েছেন। তাঁর বাস তখন উত্তরায়ণের শ্যামলী গৃহে। অপরাহ্নে দেখা করতে এসেছেন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে পল্লী জীবনের আলোচনা করে তিনি বই লিখেছিলেন। সে-বই উপহার দিতেই এসেছিলেন। প্রসঙ্গত পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের কথায় কবি এক গল্পের অবতারণা করলেন। হেসে বললেন,—এমন জাঁদরেল মেয়ে এদেশে আছে, যারা স্বাধীন দেশের ডিক্‌টেটরদের সগোত্র। রাণী ঝাঁন্সী, দুর্গাবতী বা রাণী ভবানীকে দেখিনি ; কিন্তু মেয়ে দেখেছি গাঁয়ের অতি সাধারণ ঘরের।

স্থানটি বাংলার প্রান্তদেশ। চলেছি গঙ্গা দিয়ে স্টীমারে। জমিদারির তদারকে যাত্রা। থার্ডক্লাশে যাত্রীদের ভীড় অসম্ভব। তারই মধ্যে রয়েছে একদল পুলিশ। হাত-পা ছড়িয়ে জায়গা দখল করে দিব্য আরামে তারা গল্প করছে। হন্তদন্ত হয়ে স্টীমারে উঠল এসে একদল গেঁয়োযাত্রী। দলে মেয়েই বেশি, পুরুষ দুয়েকজন। গোবেচারী সেই দুয়েকজনের নিতান্ত নিরীহ চেহারা, হাতে হুঁকো, কাঁধে পোঁটলাপুঁটলি। সকলেরই সঙ্গে

কিছু-কিছু আছে মেলার জিনিস। কোথায় মেলা ছিল। যাত্রীরা এবার ঘরমুখো। সবারই উৎকণ্ঠা, এখন কোনমতে ঘরে পৌঁছালে হয়। এদিক-ওদিক চাইছে। মুখে-চোখে অস্বস্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে অসহায়তার ভঙ্গি! লোকের ধাক্কায় ধাক্কায় সংকীর্ণ পথে ঘূর্ণীতাড়িত শুকনো পাতার দশা—কোথাও সুবিধে নেই! হঠাৎ ঐ পুলিশদলের দিকে তাদের চোখ পড়ল। জায়গার যথেচ্ছ ব্যবহার দেখে বুঝিবা একটু স্থানের আশা দেখা দিল মনের কোণে। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ। মনে উদয় হয়ে তৎক্ষণাৎ মনেই হল তা বিলীন। তা না হলে, অগ্রগামী পুরুষটি সেদিকে পা বাড়িয়েও পা ফেরাতে যাবে কেন? কিন্তু তখন ফেরাও মুস্কিল। যা ভীড়! তারা পুলিশদের পাশ দিয়েই অগত্যা জড়োসড়োভাবে বসে পড়ল। যে-যার জিনিস সামলে নিতে ব্যস্ত, এক পুলিশ সগর্জনে তাড়া লাগাল। পুরুষটি প্রথমে করুণ দৃষ্টিতে তাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা জানাল, কিন্তু কে শোনে সে মিনতি। মেয়েদের সামনে পৌরুষ জাহির করবার সুযোগ! বীরেরা একবাক্যে উঠল ধম্‌কে। পুরুষটি ঘাবড়ে গেল। হাতের হুঁকোটি তুলে নিলে, স্থানান্তরে আশ্রয়ের চেষ্টায় যেতে উদ্যত হল। এমন সময় কড়া গলায় একটা পালটা হুকুম এল দলের মধ্যে থেকে। কে যেন বললে—উঠো না, বসে থাকো, দেখি কে তোমাকে উঠোয়। সঙ্গে সঙ্গেই একই কণ্ঠ থেকে তুবড়ির মতো কথা ছুটলো, জায়গা কারোর পৈত্রিক নয়, কোম্পানীর টিকিট সমান পয়সা দিয়ে সকলেরই কেনা। সবাই যাবে। স্বর

লক্ষ্য করে দেখি দলেরই এক প্রৌঢ়া বিধবা। হাতে মুখে উল্কি, আঁচল আঁট করে কোমরে বাঁধা। এমন দীপ্ত তার কঠিন মুখের রেখাগুলি, আর এমনই তার কঠোর নির্দেশপূর্ণ ভাষা,—পুরুষটি বসেই প'ড়ল। তখন শুরু হল পুলিশদের সঙ্গে মেয়েটির সমুচ্চ তকরার। পুলিশরা গুলি গোলা ছোড়ে, বারুদ আর হাতের ব্যবহার জানে,—কিন্তু এই অতর্কিত মৌখিক বাক্য ধারা, কুলিশবর্ষী এমন তৎপর আক্রমণ, এ বোধ হয় তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। তারা সুবিধে করে উঠতে পারল না। এদিকে হৈ-চৈতে লোক হয়েছে জড়ো। কিন্তু কেউ কাছে ঘেঁষছে না। তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ তখন খাড়া-করা বন্দুকগুলির চক্‌চকে কিরিচের আগায়। কিন্তু দূর থেকে তাদের টিপ্পনির বিরাম নেই। একমাত্র সেই মেয়েটি এবং তার নেত্রীত্বে উৎসাহ পেয়ে দলের আরো কটি মেয়ে যুঝতে লাগল, অবিরাম অক্লান্ত, বাক্‌ভঙ্গি সম্বলে। মেয়েদের বিরুদ্ধে সেপাইগুলো লোক-চক্ষে নিজেদের কৌতুককর অবস্থাটা ক্রমে বুঝতে পারল। ওদের মধ্যেই তখন কারো কারো মুখ থেকে শোনা গেল,—জেনানা লোকের কাণ্ডই ভাই আলাদা! সেপাই-সৈন্যদের কি কথা খাটে ওদের সঙ্গে? দূর হোক্ ছাই। যেতে দাও ও-সব। এদিকে স্টীমারও নোঙর তুলে ঘাট ছেড়ে ভেসে চলেছে গতি বাড়িয়ে। যাত্রী-জনতার সনাতন মনস্তত্বমাহাত্ম্যে অবস্থাটা ক্রমে সহজ হয়ে এল। সকলকে বসিয়ে দিয়ে মেয়েটিও সকলের সুখ সুবিধা দেখতে হল ব্যস্ত। এক সময়ে দেখি, পুঁটলি থেকে খাবার বের করে সে সকলকে বেঁটে দিচ্ছে;—যেন একটা

পিকনিক। আবার কিছু পরে দেখি সে সকলের টিকিট মিল করছে। দলের টাকাকড়ির হিসাব চলছে তারি কাছে। পুরুষটি তার কথায় হকচকিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে ধীরে-সুস্থে সেই আবার দিচ্ছে হিসাব বুঝিয়ে। তার ভিতরের রুদ্রাণী কোথায় অন্তর্হিত, কল্যাণী মূর্তিতে সে তখন সকলের আশা-ভরসার স্থল। মাঝে মাঝে আমি এ সবই লক্ষ্য করে দেখছি। একটা স্টেশনে তারা নেমে গেল। আর কারো দিকে দৃষ্টি গেল না। ফিরে ফিরে তাকেই তাকিয়ে দেখছিলুম। আর শুধু ভাবছিলুম,—তবে এ রকম মেয়েও দেশে আছে!

গল্পটি কবিকে দিয়ে লেখাবার চেষ্টা হল। কিন্তু বার্ধক্যের ক্লান্তি ও অবহেলা মহাকবির যে কয়টি সম্ভাব্য সৃষ্টি থেকে সাহিত্যকে বঞ্চিত করেছে, এ তার একটি সংখ্যা বাড়িয়ে নেপথ্যেই রইল শেষাবধি।

এরূপ মেয়ের উল্লেখ কবির বাস্তব জীবন-সম্পর্কিত লেখায় বড় একটা নেই, এজন্যেই এর অভাবটি আরো বেশি মনে হয়।

একটু আধটু রকমফের এরকম মেয়েদেরই যেন মনের কথা মার্জিত ভাষায় দাঁড়ায় এই ঃ—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী,
পূজা করি' রাখিবে মাথায় সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। —চিত্রাঙ্গদা

জমিদারী যুগের ঘটনা। অত আগেকার বলেই বলা যায় ঘটনাটি সম্বন্ধে একটি সম্ভাবনার অবকাশ না আছে এমন নয়। ফল্গুধারার মতো এই ঘটনারই প্রভাব কবির মনের তলায় তলায় অবচেতনে অগোচর থেকে তাঁর সাহিত্যে কখনো কোনো 'চরিত্র সৃষ্টির কাজ করেছে কিনা কে বলবে! সাহিত্যের ভিত্তিতে বাস্তবের যোগ যদি কিছু থাকে তবে রবীন্দ্র-কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই চরিত্রটির মূল্য থাকা সম্ভব।

মনিব রবীন্দ্রনাথ

যেখানে প্রভুত্ব করবার ক্ষেত্র, একবার কবিকে তাঁর সেই ব্যক্তিগত আপিস পরিস্থিতে দেখা যাক্।

গুরুদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে। আশ্রম তখন তাঁর বিয়োগ-বেদনায় ভারাক্রান্ত। গুরুদেবের হিন্দুস্থানী পরিচারক মহাদেবকে পাওয়া গেল একটু নিরিবিলিতে। কিছু শুনবার ইচ্ছা হল। কথায়-কথায় সে বললে, সে দেশে চলে যাবে।

—কাজে আর মন লাগছে না। বড়বাবু নেই, সব খালি-খালি ঠেক্‌ছে। দেশ থেকে চাকরির খোঁজে এসে সাত আট বছর খুব কাজ করা হল, এবার দেশে গিয়ে চাষবাসে লাগব।

—আর চাকরি করবে না? এখানে ভালো না লাগে তো অন্য কোথাও?

জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে সে বললে,—না, বড়বাবুর কাছে কাজ করে আর কোথাও কাজ করবার মন লাগছে না। অমন ভালো কি আর কোথাও লাগবে?

বলতে পারো, কেন এত ভালো লাগত?

মহাদেব ভড়কে গেল। কেন ভালো লাগত, ভেবে তো কোনোদিন সে দেখেনি। কোন্ ভাষাতেই বা বলবে সে-কথা? চুপ করে থেকে বললে,—সারাক্ষণ তো কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।······বলতে বলতে সে থেমে গেল।

বোঝা গেল, মনে খেলছে নানাভাব বাইরে তাকে প্রকাশ করা ওর সাধ্যাতীত।

কথাটা ঘুরিয়ে বলা হল,—গুরুদেব তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন মহাদেব? খুব বকতেন? রাগ করতেন?

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পথ পেয়ে বেরিয়ে এল মনের কথা। বললে,—বকতেন না আবার ? একটু দোষ করেও কি সারবার জো ছিল। তবু দাদাবাবুকে ভয় করি, বড়বাবুকে কিন্তু তেমন লাগত না।

কেন ?

কী জানি। ভয় করত। তবু কত গল্প বলতাম তাঁর কাছে বসে—নিজেদের গল্প—ঘরের কথা। বড়বাবু লিখতেন আর শুনতেন। খোঁজ-খবর রাখতেন। শীতের দিনে বাইরে শুতে দিতেন না, বলতেন,—ঠাণ্ডা লাগবে। পাশের ছোটো ঘরটাতে শুতে বলতেন। শুতে যেতাম, রাত্রি বেলা চুপি চুপি এসে দেখে যেতেন কেমন করে শুলাম, গায়ে কম্বল দিয়েছি কি না। গরমের দিনে শুতাম বাইরের বারান্দায়। এক একদিন ঘুমের মধ্যে দরজা জুড়ে শুয়ে থাকতাম। রাত তিনটেয় উঠতেন বড়বাবু, বাইরে বারান্দায় চেয়ারে গিয়ে বসে থাকতেন। কোনোদিন আমরা দরজা জুড়ে শুয়ে থাকলে ঘরে জানালা খুলে বসে থাকতেন, তবু ডাকতেন না, পাশ কেটে ডিঙ্গিয়ে যেতেন না। পরে শুধু বলতেন,—জায়গা রেখে শুতে পারিস নে ?

অন্যায় করলে বকতেন। কিন্তু অন্যায় না করে কোনো ক্ষতি করলেও তাঁর অসন্তোষ ছিল না। একবার খুব অন্যায় করে ফেলেছিলাম।—মহাদেব অপ্রস্তুতের হাসি হাসলে। বললে,—ছবি আঁকতেন বড়বাবু। সেদিনও অনেকগুলো ছবি

এঁকে রেখে কোথায় গিয়েছেন। ঝাড়পোঁছ করছি। কাগজপত্র গুছিয়ে ঝেড়ে চলেছি টেবিলটা। কাগজের তলায় রঙের বাটি। অসাবধানে সেটা হঠাৎ উল্টে গেল। ছবির গায়ে রং লেগে একাকার। পাঁচ-ছখানা ছবি একদম খারাপ হয়ে গেল। কী হবে! দৌড়ে গেলাম অনিলবাবুর কাছে। তিনি ছুটে এলেন। উল্টে পাল্টে দেখেন রঙে-রঙে ছবি মিলিয়ে গেছে। বললাম, —কী হবে বাবু। আমি তো দেখিনি রঙের বাটি, ভিতরে খোলা পড়ে ছিল। ভেবে চিন্তে অনিলবাবু গেলেন বড়বাবুর কাছে। দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁপছি। অনিলবাবু ধীরে ধীরে সব বলে বললেন,—খুব ভয় পেয়ে গেছে মহাদেব, আপনার কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ব্যস্ত হয়ে বড়বাবু বলে উঠলেন,— ভয় পাচ্ছে কেন? ওর কী দোষ? আমারই ভুলে রঙের বাটিটা ওখানে ছিল। বলো ওকে, ভয় নাই ওর। কাছে এগোলে বললেন,—সব সময় খেয়াল থাকে না, ওখানটা ঝাড়পোঁছ একটু সাবধানেই করিস। বহুৎ আনন্দ হয়েছিল সেদিন। সেই থেকে খুব সাবধানে কাজ করতাম।

বড়বাবু বেলের শরবৎ খাবেন, বেল আনতে বললেন। আশ্রমেরই এক বাসা থেকে না বলে-কয়ে চারপাঁচটা বেল পেড়ে এনেছিলাম। কথাটা কেমন করে বড়বাবুর কানে উঠল। ডাকিয়ে নিয়ে সেদিন যা বকুনি দিলেন, মনে হল, জবাব হবে। অনেক করে ক্ষমা চেয়ে তবে রেহাই পাই। আশ্রমেরই জিনিস, আর তাঁর কাজে লাগবে বলেই এনেছিলাম। —কিন্তু এদিকে যে এমনি কড়াক্কর, তা কে জানত!

লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করতেন,—মহাদেব, দেশে তোর কে আছে, কী কী পরব হয়?—ভারী আনন্দ লাগত শুনে।—বক্‌বক্ করে আমরাও বলে যেতাম,—অন্য কে আর তা শুনতে চাইবে! কী আর সে কথা!

গুরুদেবের চোখে পরিচারকের স্থানও এমনি ছিল। তাদের সঙ্গে মজাও করতেন খুব। মহাদেবের কাছেই একটা ঘটনা শোনা গেল।—কবি একদিন ঘুমিয়ে আছেন, জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মুখে। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কতক্ষণ পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মহাদেবকে ডেকে বললেন,—শোন্। চাঁদটাকে ঢেকে দে তো। ঘুম হচ্ছে না।

দূরে গাছের মাথায় চাঁদ। মহাদেব তো ভেবেই পেল না, ওটাকে ঢেকে দেবে সে কেমন করে। বেচারা মাথা চুলকোতে লাগল। গুরুদেব হেসে বললেন,—পারবিনে? আচ্ছা এক কাজ কর্।—ঐ জানালাটা বন্ধ কর্‌তো! মহাদেব তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করতেই ঘর অন্ধকার। বললেন,—কী রে, হল এবার? চাঁদ ঢাকা পড়ল?

এতক্ষণে মজাটা বুঝতে পেরে বেচারা মুখ নিচু করে হেসে ফেললে।

বনমালী তাঁর অনেক দিনের পরিচারক, উৎকলবাসী বৃদ্ধ। গুরুদেবের একটি গান তার খুব প্রিয়। সেটির উপর একটু বিশেষ দাবিই সে করে থাকে। গানটি বসন্তের এবং বহু পরিচিত। কিন্তু বনমালীর ব্যাখ্যা হচ্ছে, এক সময়ে ঘরের মধ্যে তাকে আসতে-যেতে দ্বিধা করতে দেখেই নাকি গুরুদেব

গেয়ে উঠেছিলেন,—'হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি'। গানটির পাঠ নিয়েও তার মতান্তর আছে। তার উক্তি হচ্ছে—'হে মাধবী জিধা কেন'......দ্বিধা নয়,—তার কানে যে স্পষ্ট লেগে আছে—জিধা। তার গল্প থেকে মোটামুটি যা দাঁড়ায়,—বসন্তের গানের আমেজে কবির মন বিভোর। সে সময়ে কর্মরত ভৃত্য রচনারত প্রভুকে কাজের মুখে বাধা দেবে কিনা ভাবছে। ঘরের দরজায় একবার পা বাড়িয়ে আবার পশ্চাৎপদ হচ্ছে। এদিকে এই বিব্রত অবস্থা—ওদিকে কবির চোখে যেই পড়া, অমনি কবিকণ্ঠে নূতন গানের কলি গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে—'হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি, আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি'। বনমালীর মনে কিন্তু সেই থেকে কবিগুরুর রচনার একটি উপলক্ষ হয়ে থাকার আনন্দ অক্ষয় হয়ে রইল। কবিও তাঁর ভৃত্যের এই আনন্দ ও গৌরবের পরোক্ষ আলোচনাটুকু উপভোগ করতেন সহাস্য-মুখেই। নীলমণি, লীলমণি—প্রভুর কাছে নানা অবস্থায় নানা কৌতুককর নামে অভিহিত হয়েছে এই পুরাতন ভৃত্য বনমালী।

মাথায় টাক আছে, তাই পার্শ্বচর শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী নাম পেয়েছিলেন—'বলডুইন'। বল্‌ড্—টেকো, ইংরেজ মন্ত্রী বল্‌ডুইনের নাম দিয়ে পার্শ্বচরের পরিচয়টি কৌশলে মিলিয়ে নিয়ে রহস্য জমাতেন ঐ নামে। বিশ্বভারতীর চাঁদা আদায় ব্যাপারে মাড়োয়ারিমহলে ঘুরতেন বলে ডাকতেন তাঁকে 'সুধোড়িয়া'। এইরূপ আশ্রমের অনেক কর্মীর সঙ্গে কবির রহস্যপ্রিয়তা স্নেহপ্রীতিতে সমুজ্জ্বল।

কবি একদিন দুপুরে কবিতা লিখছেন। ডেকে পাঠালেন। নিজের হস্তাক্ষর মুক্তাবলীর সৌন্দর্যে প্রসিদ্ধ, তবু ঐ ছিল এক বাতিক। কাটাকুটি হয়নি, একাধিক কপিও করা হয়েছে, তবু কবিতা লিখেই অনুচরটিকে দিয়ে কপি করানো চাই। তখ্খুনি আবার ফিরে-ফিরে দেখতেন সেটি। বিচার বিশ্লেষণ করতেন এমনিভাবে যেন অন্যের কবিতা। তারপরে প্রয়োজন হলে চালাতেন কলম। সেদিনও কবিতা লিখেই ডাকছেন। কর্মীটি তখন আটকা পড়েছেন কার্যান্তরে। তাঁকে ডেকে না পেয়ে গুরুদেব রেগে অস্থির। অনেকক্ষণ পরে কর্মীটি ফুরসৎ পেয়ে আপিসে ফিরতেই পার্শ্বচর সুধাকান্তবাবু তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব কতক্ষণ রইলেন গম্ভীর হয়ে। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—দেখছি আরেকজন লোকের দরকার হল। তোমার কত কাজ! তুমি আসতে পারবে কেন আমার এই তুচ্ছ কাজে। আমারও এদিকে কাজ চলছে না;—কিছু একটা ব্যবস্থা তো চাই-ই। তিনি থামলে কর্মী সামনা-সামনি আর কিছু বললেন না। সরে এসে সুধাকান্তবাবুকে সব বুঝিয়ে বললেন। তিনি তখন তাঁর হয়ে কর্তাকে গিয়ে বললেন যে, কর্মীর ইচ্ছাকৃত অপরাধ এ নয়। রুটিনে এ সময়ে তাঁর অন্য কাজ নির্দিষ্ট, আর সে রুটিনের নির্দেশক হচ্ছেন স্বয়ং গুরুদেবই। শুনে বললেন,—বেশ, কখন তাঁর কী কাজ থাকে জানাতে বোলো।

কর্মী তাঁর কাজের তালিকা দিলেন। গুরুদেব বুঝলেন রাগটা অহেতুক। তখখুনি ডাকিয়ে নিয়ে কর্মীকে আদেশ

করলেন,—তাহলে তোমাকে তো দেখছি দুপুর থেকে সারা বিকেলই থাকতে হয় কাজে। বিকেলেও যখন এখানেই থাকো জলখাবারটা তুমি এখন থেকে এখানেই খাবে, বুঝেছ ? অন্দরে পাঠালেন খবর। তখুনি আদেশ হল চাকরদের উপর। কর্মী তো বিস্ময়ে অবাক। কোথায় গর্দান্ আর কোথায় জলখাবার, তা আবার রোজ-বরাদ্দ। পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। গুরুদেবের আদেশ,—তাঁর পরিচারকেরাও ছাড়বে না। বলে, —না খেলে, বাবামশায় শুনলে আমাদের বকবেন,—আপনাকে খেতেই হবে। অগত্যা কদিন খেয়ে কর্মীটি চাকরদের বলে রদ্ করালেন খাবার দেওয়া। গুরুদেবকে জানাতে বারণ করে দিলেন। কেটে গেল দিনপনের, হঠাৎ একদিন খেয়াল হল। প্রশ্ন করে গুরুদেব জানলেন আসল ব্যাপারটা। ধরে নিলেন চাকরদের অসাবধানতাই এর মূল কারণ। বেচারারা পড়ল বেকায়দায়। তখন কর্মীটি আবার নিজে গিয়ে গুরুদেবকে অনেক অজুহাত দেখিয়ে খাওয়া থেকে ছুটি পেলেন। 'প্রহাসিনী' কাব্যের অন্তর্গত 'তুমি' নামক কবিতাটি এই ঘটনার প্রথম দিনে রচিত। তার ভিতরে আছে 'ছাপাখানার ভূত' মানুষটার কৌতুককর বর্ণনা। তাতে কবিমনের তখনকার রাগের আভাস কিছু মিলবে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিরাট পুরুষ; সামান্য কর্মীদের কাছেও তিনি হৃদয় মেলে দিতেন অকাতরে। ক্ষুদ্র জীবনের নানা বড়ো বড়ো চাপের মধ্যে কর্মীদের ঐটুকুই ছিল পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। বেতন চুকে যায় হাতে-হাতে, সেখানে দাতার সঙ্গে

গ্রহীতার সম্বন্ধ নির্দিষ্ট কালের। কম মনিবই মিলে, বেতনের উপরেও যে দিতে পারে এমন-কিছু, যার মূল্য কালে বাড়ে ছাড়া কমে না।

মৃত্যুর কিছুদিন আগেকার কথা—'অরূপ-রতন' অভিনয় হবে। গুরুদেব নেমেছেন অদৃশ্য রাজা ও ঠাকুরদার ভূমিকায়। কলকাতায়ও যাওয়া হবে। সোৎসাহে সব আয়োজন চলছে। কবি পুরানো এক কপি হাতে নিয়ে নূতন করে বইটি লিখতে শুরু করলেন। স্থল-বিশেষে অনুচরের মন্তব্য শুনতে লাগলেন, কেটে-ছিঁড়ে তিনিও চললেন লিখে। এদিকে সময় হয়ে গেল অভিনয়ের। সে-খেয়াল হতেই গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নূতন লেখা অংশ এত যোগ হয়েছে যে, পুরানোটা আর মনে লাগছে না;—আদেশ হল বইটাকে ২য় সংস্করণ করে ছাপাবার। গোটা বইটার প্রুফ আসছে আর গোটা বইটা ব্যাপীই চলছে পরিবর্তন। এরূপে ৬।৭ বার প্রুফ আসার পর তাড়া পড়ল,—একদিনের মধ্যেই চাই ছাপানো বই—গোটাটাই, অন্তত আট-দশ কপি। অভিনেতাদের দিতে হবে, হাতে হাতে কপি না পেলে মহড়া এগোচ্ছে না। ডেকে বললেন,—উৎসাহ তো দিলে। এখন যে নূতন বই না হলে সব অচল। যে করেই হোক আজ সন্ধ্যের মধ্যে বই চাই-ই।

নীরবে নিয়ে আসা গেল গুরুভার। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। উত্তরায়ণে জ্বলে গেছে আলো। কোণার্কের বারান্দায় সব প্রস্তুত, মহড়া শুরু হবে। গুরুদেব এসে বসলেন, আর বসেই খোঁজ পড়ল বইয়ের। বই না পেয়ে রেগে আগুন। বলতে লাগলেন,—জানি, হবে না বই ছাপা—তবু বাহাদুরি। এখন

কোথায় রইল সে, কী করে হয় রিহার্শেল ! সব কাজ মাটি। আমাকে আগে বললেও যা-হয় ব্যবস্থা করতুম।

সৌভাগ্যের কথা, শান্তিনিকেতন-প্রেস-কর্মীদের তৎপরতায় বই সেদিন ছাপা হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার আগেই। পেছন দিক হতে ধীরে ধীরে এক কপি বই এগিয়ে দেওয়া হল তাঁর হাতে। প্রথমটা তিনি বুঝতে পারলেন না, ভাবলেন, বুঝি পুরানো বইটাই ; বলে উঠলেন,—এটা কে চায়, এ দিয়ে কী করব ? বলতে বলতে ততক্ষণে একটু উল্টে-পাল্টে দেখেছেন। আশ্চর্য হলেন। কথা তো রেখেছে ! কিছু বললেন না। চোখে-মুখে একটি রেখারও হল না রূপান্তর। তাড়াতাড়ি শুধু তুলে নিলেন ফাউন্টেন পেন্‌টা। কী লিখলেন, তারপর ডাক পড়ল। এত তাড়াহুড়ার কাজ—কোথাও নিশ্চয়ই ছাপায় ভুল হয়েছে—এই আশঙ্কাতেই বুক তখন দুরু-দুরু। কী নাকালটাই না হতে হবে এই মণ্ডলীর মধ্যে ! জানতাম বই ছাপায় একটু ভুল হলে তাঁর কী রকম রাগ হয়। কাছে গেলাম। গুরুদেব গম্ভীর মুখে বইটা তুলে দিলেন হাতে। কেঁপে গেল হাত। কিন্তু বইটার দিকে চেয়ে হতভম্ব। ক্ষণপরেই অবশ্য বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী। মুখের দিকে চেয়ে গুরুদেব ততক্ষণে মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসছেন। মৃদু চাপা সুরে বললেন,—তা নয় তো কী ! এ বই তো তোমারই। তুমিই তো বলে বলে এতটা লেখালে, আর ছাপিয়ে দিলে এরি মধ্যে। এ আমার নয়,—তোমার।

বইয়ের তলার দিকে যেখানে ছাপা ছিল নাট্যকারের নাম, দেখা গেল সেটা কাটা। লিখে দিয়েছেন,—'শ্রীসুধীরচন্দ্র কর'।

আলাপে কবির স্বভাব-সুলভ রহস্যকৌতুক বহু জ্ঞাত। রসজ্ঞ বিজ্ঞজনদের তো কথাই নেই, বহু লোকেই তার আস্বাদ পেয়েছেন। অনেকস্থলে সেই আলাপ তাঁর খ্যাতিবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। অনেকের সঙ্গে আলাপ আবার সদ্য-সদ্য যোগ্য প্রত্যুত্তরে রসসৃষ্টি করেছে, তাঁকে আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু যাদের দিক থেকে মৌন অনুভব ছাড়া প্রতিদানের কোনোই সম্ভাবনা ছিল না, এমন কি চোখের দিকে চাইতেও যাদের সংকোচ,—তুচ্ছ সেই কর্মীদেরও তিনি এই কথার রসে বঞ্চিত করেন নি। তাঁর দিক থেকে সামান্যকে মনে করার একটি তুচ্ছ ঘটনা :—কর্মী এসেছেন সদ্য বিবাহ করে। নববিবাহিতকে কবি ডাকলেন। একখানা নূতন বই তাঁর হাতে দিয়ে বলে উঠলেন,—গিন্নিকে নিয়ে দাও, সুগৃহিণী হবার শিক্ষা পাবে।

নানা রকমের বই আসত তাঁর কাছে। সেখানা ছিল গৃহলক্ষ্মী ধরনের একখানা উপন্যাস। ভিতরে ছবি-দেওয়া। একখানা ছবিতে ছিল,—বিশাল বপু, স্ফীতোদর কর্তা খেতে বসেছেন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে পাশে বসে প্রৌঢ়া গৃহিণী ব্যজনরতা ; নাকে প্রকাণ্ড এক নথ, কস্তাপেড়ে সাড়ি পরা। অর্ধাঙ্গিনী তিনি নন, আয়তনে কর্তাই তার অর্ধাঙ্গ। চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী। ছবির তলাতে লেখা 'পতিপূজা'। ছবিটা দেখিয়ে গুরুদেব হেসে বললেন,—কী হে, এমন গৃহিণীই তো সুগৃহিণী, কী বলো ?

তাঁর সাহিত্যিক দানের ঐশ্বর্য ও ঔদার্যে কী অভিজাত, কী সাধারণ, কাউকে তিনি বঞ্চিত করে যাননি। অনেকস্থলে

'পারব না' বলে লোকের আবেদনকে প্রথমটা হয়তো নাকচ করে দিতেন। অনেক পত্রিকাওয়ালা বা 'স্বলেখন'-প্রার্থীদল এ বিষয়ে বহু প্রমাণ পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ যে বিমুখ না হয়েছেন এমনও নয়। তবে দাবির জোর থাকলে সেটা পূর্ণ হত। বাইরের এই সাময়িক তাগিদের থেকেও বের হয়েছে তাঁর অনেক বিখ্যাত লেখা। কেউ লেখা চাইলে বিমুখ করতে বাধ্‌ত;—তবু কী লিখবেন, সেটা প্রার্থীর মনঃপূত হবে কি না, এই সমস্যাটিই বোধ হয় প্রথমে দ্বিধা জাগাত। মনের এ ইতস্তত ভাব ছিল প্রথম থেকেই। বিশেষ করে সবুজপত্রের যুগে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মশায়কে লেখা চিঠিগুলি হতে তা জানা যায়। তা ছাড়া, তাঁর সৃষ্টির বেগ ছিল অফুরন্ত, সময়ের পড়ত টানাটানি। বাইরের কেউ লেখা চাইতে গেলেই বলতেন,—বটে, ওসব হবে না। আর আমি পারিনে। আমি কি ছ্যাকড়া গাড়ি? লোকের দাবি বয়ে বেড়াব! এমনি ওজর দেখাতেন। কিন্তু দেখা যেত, তাদেরই দিয়েছেন অজস্র, যারা আগে পেয়েছেন ভৎসনা।

চমকে দিয়ে মজাও করতেন মাঝে মাঝে। মৃত্যুর বছর তিন চার আগে, কর্মীর প্রথম ছেলের নামকরণ। কর্মীটি গেলেন গুরুদেবের কাছে—একটি নাম চাই। গুরুদেব তখন তাঁর 'আকাশপ্রদীপ' কাব্য রচনা শেষ করে অন্য কাজে হাত দেবার চেষ্টায় আছেন। মুখে মুখে বলে দিলেন দুটো নাম—সুমিত এবং সুকৃত। কিন্তু সে দুটো আগেই আশ্রমে ব্যবহৃত হয়ে গিয়েছিল। দিলেন পাল্টে আরেকটা। এখন কর্মীর ইচ্ছে গুরুদেব কার্ডে তাঁকে একটু আশীর্বাদী লিখে দেন; দু-চার লাইন কবিতা। অনেকের

এমনি ইচ্ছা তো তিনি পুরিয়েছেন, কর্মীটিও ধরলেন তাঁর ভিক্ষার থালি। কবি একেবারেই নারাজ। বললেন,—মনের আশীর্বাদেই হবে, যাও, আমার সময় নেই। কর্মী তবু আরো দুয়েকবার বললেন। কাজের মুখে বেশী বলতে ভরসা পেলেন না। কিন্তু কবি বুঝলেন। সপ্তাহ বাদে একদিন সকালে বসেছেন মৃন্ময়ীর চাতালে। কিছুদিন সকালবেলার কাজ করতেন ঐখানে বসেই। ঘরটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার সান্-বাঁধানো মেজে পড়ে আছে ; উত্তর-পূর্ব কোণে একটু ছাদ দিয়ে ঘেরা, সেখানে কবিরই ইচ্ছায় তাঁর ভোরে বসবার জায়গা হয়েছে। সেদিন কর্মীটি আবশ্যক কাজের জন্য সামনে যেতেই এগিয়ে দিলেন একখানি কার্ড। বললেন,—হল তো ? কর্মী বুঝতেই পারলেন না, কী হল। কোনো চিঠির নকল রাখতে হবে মনে করে সেটি যেমন সে হাতে নিয়ে ফিরবে, কবি বললেন,— দেখলে না ? এবারে কর্মী পড়লেন। দেখলেন, তাঁরই প্রার্থনার সাড়া ; আশীর্বাদী একটি ছোট্ট কবিতা। দিনের প্রথম কাজ কবির সেদিন ঐটি। বললেন,—দিলেম সেরে, না হলে তো নিস্তার নেই ; রাজ্যের কাজ পড়ে আছে, আর কেউ কিন্তু জ্বালাতে পারবে না—এবার আমাকে মহাভারত নিয়ে লিখতে বসতে হবে। কবি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে মহাভারতের বক্তৃতা লিখবেন বলে তৈরি হচ্ছেন। যাক্, প্রার্থনাটি মনে রেখেছেন এবং এতখানি কৃপা করেছেন—এই অভাবিত সৌভাগ্যের আনন্দ কর্মীকে অভিভূত করে ফেলল। ছেলের নাম দিয়েছিলেন—'সুপ্রভাস'। অর্থ জিজ্ঞেস করায় বললেন,—

সুপ্রভাস মানে, যা আলো ছড়িয়ে সব উজ্জ্বল করে। পছন্দ হয়েছে তো? নামটা পোশাকী হিসাবে উৎকৃষ্ট, ব্যবহারে একটু ভারী; কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। বকুনি দিয়ে বললেন,—যত মেয়েলি নামের রুচি। যত কাব্যিক আর দুর্বল নামের ছড়াছড়ি! পৌরুষব্যঞ্জক নাম বড়ো আজকাল একটা কানে ঠেকে না। দেখো তো, আগের কালের রুচি! কেমন সব বড়ো, ওজনে-ভারী নাম, বলতে সব-মুখ ভরে বলতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, জয়দ্রথ, বভ্রুবাহন, কার্তবীর্যার্জুন—মহাভারতের এসব নামের মধ্যেই সেকালের পুরুষ-চরিত্রের ভূমিকা প্রকাশমান।

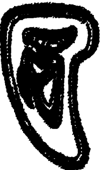
কবিকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করা গেল। কবিতাটি ছিল এইরূপ—

ভোরের কলকাকলীতে মুখর তব প্রাণ,
জাগাবে দিন সভাতলে আলোর জয়গান।

ছেলেটির মায়ের নাম ওর সাথে যুক্ত হবার অবকাশ ছিল। কর্মী 'ভোরের' শব্দটির স্থলে কবির হাতেই একটি শব্দ ওতে লিখিয়ে নেবার প্রার্থনা জানালেন; তাও পূর্ণ হল। লিখে দিলেন—

উষায় কলকাকলীতে মুখর তব প্রাণ,
জাগাবে দিন সভাতলে আলোর জয়গান।

সব-সময় বলবার মতো আরেকটি নামও শেষে বলে দিয়েছিলেন, —'সুব্রত'। ঐ নামটিই চলতি হয়।



"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

[illegible],
উদয়
~~[illegible]~~, [illegible]
[illegible] প্রাণ
[illegible]
[illegible] ।

[illegible]

[illegible]

দেখা-সাক্ষাৎ

কবি সেকালের সমসাময়িকদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা বলতেন খুব আন্তরিকতা দিয়ে। বোঝা যেত, তখন অমন আর একটি সুহৃৎ তাঁর ছিল না। বৈদগ্ধ্যে, যুক্তিনিষ্ঠ সরল সতেজ রচনায় ও সজ্জনোচিত আচরণে কবির শ্রদ্ধা বিশেষ ভাবেই তিনি আকর্ষণ করেছিলেন। কবি নিজের মনের সাড়া পেয়েছিলেন তাঁর উদার মনে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায়ও কবির সঙ্গে প্রীতি-সম্বন্ধকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন চিরদিন। শেষাবধিই এই জ্ঞানবৃদ্ধ কর্মীপুরুষ কবির সশ্রদ্ধ সমাদরের পাত্র হয়ে ছিলেন।

সকালে উদয়নের দক্ষিণ বারান্দায় কবি বসেছেন লিখতে। রামানন্দবাবু গেলেন দেখা করতে। কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর কথা শুরু হল। তখন 'ছেলেবেলা' গ্রন্থ বেরিয়েছে; কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধুভাষা ছেড়ে সোজা বাংলায় ভরিয়ে দিয়েছি বইখানিকে। আর্যদের আগে দ্রাবিড়দের প্রভাবে ছিল জন-সংস্কৃতি। জনতার সাহিত্য, শিল্প সবই ছিল সহজ রসালো কাব্যময়। সংস্কৃত হচ্ছে জ্ঞান-সাধক আর্যদের ভাষা! বুদ্ধির প্রভাবে অলংকার পরে সে হয়েছে সুশ্রী, কিন্তু হয়েছে আবার জটিল জমকালো। শক্ত পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে এ ভাষার প্রতিষ্ঠা। প্রাকৃত জনের ভাষা দেখতে দুর্বল, প্রাণে সবল—সংস্কৃত দেখতে সবল কিন্তু প্রাণে দুর্বল। চণ্ডিদাস আর বিদ্যাপতি, দুদিকের প্রভাবের

দুই সুন্দর নিদর্শন। চণ্ডিদাসের সরল কথা, ভাষাভঙ্গি সহজ, সাধুভাষী পোশাকী বিদ্যাপতির চেয়ে সে বেশি মন কাড়ে। মালদহের গম্ভীরা, ময়মনসিংহ-গীতিকা ও সারা বাংলার বাউল কীর্তন প্রাকৃত জন-সাহিত্যের ফল্গুধারায় কী সম্পদই না বয়ে নিয়ে চলেছে! খুঁড়লে এরূপ অনেক মণি বেরবে। আমরা খোঁজ রাখি না-রাখি, তলায় তলায় সারা দেশে চলেছে একটি সহজ ধারা। প্রাকৃত সাহিত্য সেই সহজ শিল্প-সৌন্দর্যে মনোহারী, সংস্কৃত জ্ঞানের গভীরতায় মহৎ। আমরা আর্যত্বের গৌরব নিতে ব্যস্ত; কিন্তু সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যকলায় ও লোকাচারে—অর্থাৎ জীবনের সহজ সুকুমার প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রায় আমরা অনার্য প্রাকৃত-ধারায় সঞ্জীবিত। তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়। একদিন সংস্কৃত হয়তো প্রাকৃতের সহজ সাবলীলতাকে জায়গা ছেড়ে দেবে,—এ কিছু বিচিত্র নয়। এই প্রাকৃতের রসে মন টেনেছে আজ শেষবেলায়। কেন জানি, সহজ হতেই ভালো লাগছে; অলংকারের আভরণ সহজ কথাকে ঢেকে ফেলে, পীড়া দেয়। আজকাল লেখার বেলায় সেটা খুব বেশি অনুভব করছি। তাই 'ছেলেবেলা'কে দিয়েছি ঝরঝরে করে। খাটুনির চরম, এখন দেখছি সহজ হওয়াই কঠিন।

এ নিয়ে কিছু লিখলে ভালো হয়,—কথাটা কবিকে বলতেই একটু কৌতুকহাসির সঙ্গে বললেন,—লিখলে পণ্ডিতেরা কি রাখবে? সুনীতি চাটুজ্জেদের ভয় লাগে। কবি 'ছেলেবেলা' বা 'গল্পসল্প' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফে মাছের কাঁটা বাছার মতো করে তুলে ফেলেছেন সংস্কৃত শব্দ, ঐ সঙ্গেই উঠে গেছে

জটিল ভঙ্গি। বারে বারে সংশোধনে বসিয়েছেন সহজ কথ্য বুলি।

চীনের উপরাষ্ট্রপতি মনীষী তাই-চি-তাও এসেছেন। কবি শয্যাগত, উদয়নের একতলার দক্ষিণ কক্ষে। সকালবেলা ৯টা-১০টা হবে। কবি শুয়ে শুয়ে খুব ধীরে ধীরে বাংলায় তাঁর স্বাগত-সম্ভাষণের সহিত বিশ্বভারতীর আদর্শ সব বলে যাচ্ছেন। অনিলবাবু তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ইংরেজীতে। তাই-চি-তাওকে তাঁর একান্ত-সচিব আবার চীনা ভাষায় ওদিকে বোঝাচ্ছিলেন। সুদীর্ঘ আলাপের ক্ষেত্রে অনুবাদের মধ্য দিয়েও দুই মহাব্যক্তির আন্তরিক যোগ নিবিড় হয়ে উঠেছিল; তা থেকেই দুই মহা-দেশের হৃদয় ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা গিয়েছিল আরো বেড়ে। অনিলবাবু ছিলেন এই বিখ্যাত সাক্ষাতের যোগসূত্র। এটা অনেকটা ঘটনাচক্রেই হয়েছিল, কারণ সুস্থ অবস্থায় গুরুদেবের দোভাষীর প্রয়োজন হত না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, তাই-চি-তাও ছাতিমতলার সুব্যবস্থার জন্য বিশ্বভারতীকে দশ-হাজার টাকা দান করেন।

কবির আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে যাঁরা শান্তি-নিকেতনে এসেছিলেন তাঁদের তত্ত্বাবধান নিয়ে কবির ছিল এক মহা উদ্বেগ। আমাদের দেশের দরিদ্র ব্যবস্থায় তাঁদের যথোচিত সেবার অক্ষমতা নিয়ে মনে মনে তিনি লজ্জিত থাকতেন। তাঁদের খবর নিতেন এবং মাঝে মাঝে নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ আলাপ-আপ্যায়নে আন্তরিকতার স্পর্শ দিতেন। এরূপে নানা-ভাবেই বাইরের ত্রুটি প্রীতি দ্বারা পূর্ণ করতে চেষ্টা করতেন।

এঁদেরই নিয়ে বড়দিন উপলক্ষে একবার উত্তরায়ণে এক বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান হয়েছিল সম্পূর্ণ বিলাতী প্রথায়।

শান্তিনিকেতনের খোয়াইডাঙ্গায় বিভিন্ন সময়ে এসে মিলেছিলেন রুশিয়ার পণ্ডিত বকদানভ, ফ্রান্সের বেনোয়া, ইংরেজ কলিন্স, এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন, এলমহার্স্ট। আশেপাশেই ছিলেন সুরপুরীতে ফরাসী পণ্ডিত লেভি, জার্মান উইণ্টারনিজ, খোড়ো ঘরে ডাচদম্পতি বাকে, আমেরিকার সস্ত্রীক ডাক্তার টিম্বার্স, প্রাট; টাকার-দম্পতি ও গ্রীণ, আর্থার গেডিস্, এছাড়া ইটালীর তুচ্চি, ফর্মিকী, চেকোশ্লোভেকিয়ার লেজনি, ওলন্দাজ শ্রীমতী ভ্যানঈগান, পারস্যদেশীয় পণ্ডিত পোরঈদাউদ, হাঙ্গেরিয়ান গারমানুস, আরো কত য়ুরোপীয় ও এশিয়ান। চৈনিক এন. সি. লিম, তিব্বতী লামা, জাপানী কবি নোগুচি, মাকিসান, তোমিতোসান এবং সিয়ামের তরুণ বৌদ্ধ শিল্পী, বার্মা ও সিংহলেরও কত বৌদ্ধ ভিক্ষু! কবির বাণী, ব্যক্তিত্ব এবং সমাদরপূর্ণ আন্তরিক আতিথেয়তা এঁদের বেঁধে রেখেছিল এক নীড়ে।

আশ্রমের সকলেই যে এঁদের তেমনি ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে তা নয়, তা সম্ভবও নয়। সকলে যে কবির এই বৈদেশিক যোগকে আশ্রমজীবনেও সহজভাবে দেখতে পেরেছে তা-ও নয়। বরং দেশের স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় ঘরে-বাইরে এই যোগ সাহেব-ঘেঁষা পাশ্চাত্য প্রীতি, বা গরীবের ঘোড়া রোগ বলেই নেপথ্যে পেয়েছে কটাক্ষ। কবি এই অস্বস্তিকর অবস্থাতেও এঁদের রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট থেকেছেন বরাবরই।

আন্তর্জাতিকতার পুরোহিত ছিলেন বলে তিনি যে স্বদেশের

জাতীয় সত্তার প্রতি উদাসীন ছিলেন তা নয়। দেশেরও বহু নেতাই কবির সাদর সংবর্ধনা ও আতিথ্য লাভ করেছেন একাধিকবার। তাঁদেরকে এনে কবি আশ্রমবাসীদের বাণী শুনিয়েছেন, নিজের ভাষণে তাঁদের পরিচয়কে করে দিয়েছেন সকলের কাছে সমুজ্জ্বলতর। বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা জাতীয় উৎসব উপলক্ষে আশ্রমে সভা-সমিতি করে তাতে সমস্ত অবস্থা আলোচনা করেছেন, কর্তব্যাকর্তব্য দিয়েছেন নির্ণয় করে। মহাত্মাজী শান্তিনিকেতনকে তাঁর ঘর বলেই গ্রহণ করেছিলেন। কবি নিজের প্রিয় আবাস 'শ্যামলী' তাঁকে দানই করে গেছেন। জওহরলালও এসেছেন একাধিকবার কবির খাস অতিথি হয়ে। একাধিকবার এসেছিলেন সরোজিনী নাইডু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদেরও আগমন ঘটেছিল, খান আবদুল গফুর খাঁর আগমনও ভুলবার নয়।

খান সাহেবের পুত্র এবং পণ্ডিত নেহেরুর কন্যা শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শেষ গৌরব অবশ্য আজাদ হিন্দ ফৌজ। কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর সাংস্কৃতিক মিলনের সাধনকেন্দ্র মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কবির হাতে। সুভাষকে নেতার রাজতিলক পরিয়েছিলেন প্রথমে কবি। কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে যখন দেশে বাদবিতণ্ডার অন্ত নেই, রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন আশীর্বাদ নিয়ে সুভাষের জয়যাত্রায়। দেশের সংক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে তিনি যে অভিনন্দন লিখে দেন, সেটি থেকেই তাঁর সুভাষচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহের গভীরতা বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্রের

শক্তি ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কবির দূরদৃষ্টির বাণী যে মিথ্যা নির্দেশ করেনি, বাস্তব তা পরে প্রমাণ করেছে।

কবির কাছে আসতে পেরেছে সাধারণ লোকেরাও। গ্রামের লোক, মেয়েছেলেরা, বোষ্টম, ভিখারী, চাষী, প্রজা,—সবাই এসেছে। অনেকে পোঁটলা-পুঁটলিসহ এসে, ধীরে গৃহে প্রবেশ করে প্রণাম জানিয়ে চলে গেছে। কোথা থেকে আসা, চাষের অবস্থা কেমন, ফসল কেমন হয়েছে, এবং আশ্রম দেখা হয়েছে কিনা—ইত্যাদি দু-চারটি কথা বলে কবি তাদের সন্তোষ বিধান করতেন। কেউ কেউ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ে চেয়ে দেখত তাঁকে একদৃষ্টিতে ; তখনই কবি হতেন উত্ত্যক্ত ; চলে যেতেন কক্ষান্তরে। অনেকে প্রার্থী হয়ে আসত। পাত্র বুঝে একান্ত সচিবকে বলে দিতেন ও-বাড়িতে (উদয়নে) নিয়ে গিয়ে কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতে। ভিখিরিদের দেবার জন্যে চাল রেখে দিতেন চাকরদের কাছে। সকালের রোদটি আঙ্গিনায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখিরাও ভোজ পেত তা থেকে।

লোকের দাবিদাওয়া, লোকসঙ্গ—এসব একদিকে যেমন এড়াতে চাইতেন, তেমনি আবার তার বেশি অভাব হলেও তাঁর ভালো লাগত না। মহানগরীর মুখ দীর্ঘদিন না দেখতে পেলেই যেন জাগত অস্বস্তি। আধুনিক জীবনের উষ্ণতা পাবার জন্যে ছিলেন ব্যাগ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা, অভিনয়, গীতালি, বিশ্বভারতী-সংসদ, বিশ্বভারতী সম্মিলনী—এসব কোনো না কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যোগ দিতেন গিয়ে কলকাতার জন-জীবনে। অবশ্য শিক্ষিত-মহলেই থাকতেন পরিবেষ্টিত ; তবু

জয়ন্তী, মহাজাতিসদন, কোনো কোনো রাজনৈতিক সভাতেও জনতা তাঁকে তাদের নিকটে পেয়েছে।

অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র মৈত্র এলেন কবি-সাক্ষাতে। সকালে বেলা ৮টা-৯টা হবে। 'পুনশ্চ'—গৃহের উত্তরাংশের বসবার কক্ষে দুজনের আলাপ চলে। অনেক কথার মধ্যে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কবি এই আলাপসূত্রে জানিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। সাধারণের আর্ট-গ্যালারী ও জাতীয় নাট্যশালা সঙ্গে নিয়ে বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক ও সমঝদারদের সম্মেলনে একটি গুণী-মহল কলকাতায় থাকা আবশ্যক। উদ্দেশ্য, দলাদলির বাইরে থেকে সব দলেরই লোক নিয়ে এই মণ্ডলী কাজ করবেন। মাঝে মাঝে লিখে এনে কেউ পড়বেন, বিশেষ বিশেষ নাটকের হবে অভিনয়, নাচগানের জলসাও থাকবে তার সঙ্গে এবং একটি চিত্রপ্রদর্শনীও। কিন্তু মামুলি কিছু নিয়ে নয়, —এটাই তার বড়ো কথা হবে। রচনায় কোনো বিশিষ্টতা থাকলেই ধরা হবে তা সাধারণের কাছে। খুব দেখেশুনে ভালো করে মহড়া দিয়ে খেটেখুটে করলে, অভিনয়াদিতে সাধারণ থেকে আগ্রহ এবং অর্থানুকুল্যের অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু সাধারণের সস্তা চাহিদা একে না চালায়, সেদিকে রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি। আগে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' ছিল অনেকটা এরকমেরই অনুষ্ঠান,—ছিল তা দেশের শিল্প-চেতনার আদর্শ কেন্দ্র। তবে সেটা হয়ে গিয়েছিল ঘরোয়া ব্যাপার। এই প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানটিকে ব্যাপক করতে হবে—আজকালকার কলকাতার সমাজ অনুপাতে। দেখতে হবে

কোনো অংশ যাতে বাদ না পড়ে আধুনিকের সঙ্গে যোগের সেতু তো আজ বন্ধ। এতে সাহিত্যটা তেমন ঠেকে না থাকলেও অভিনয়াদি শিল্পের গতি খোলে না বড়োদিকে। আমাদের বড়ো সৃষ্টি কই! কিছু-কিছু ভালো জিনিস না হয়েছে নয়, কিন্তু আরো ভালো জিনিস হতে সাহায্য করত সংঘ-উৎসাহ, সংঘ-বিচার। তেমন কিছু সংগঠনের চেষ্টা দেখলে কবিও তাতে নিজের উপস্থিতি দ্বারা সাড়া দেবেন অংশ নিয়ে. এরূপ কথাও হয়।

কবি আরো বললেন,—আজকালকার সাহিত্য-সাধনা চলেছে অনেকটা ব্যক্তিগত ভাবে। আগেকার মতো বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক মফঃস্বল অধিবেশনের তো আজ দেখাই নেই। তুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে এক-একটা দল পাকিয়ে গোষ্ঠী খাড়া করা হয়, সঙ্গে থাকে একটি মুখপত্র। এদের মধ্যে যে কোনো পক্ষের কোনোদিকে ইতরবিশেষ কিছু আছে, তা তো মনে হয় না। সংগঠন-প্রণালীতে আর্ট চর্চার কোনো উদার চেষ্টা দেখা যায় না। সাহিত্য-পরিষদ আছে পুরানো নিয়ে। নূতন সৃষ্টির উৎসাহ যুগিয়ে আধুনিকদের থেকে নূতন নূতন জিনিস বের করে নেবার সে আহ্বান কই, আয়োজন কই?

মৈত্রমশায় একজন অতি-আধুনিক উদীয়মান কথা-সাহিত্যিকের কথা কবিকে বলেছিলেন, তখন ছিলেন যিনি স্বল্পবাক্, স্বল্পবয়স এবং স্বল্পদর্শন একান্তই গৃহকোণের গ্রন্থকীট। আশ্চর্য তাঁর আপন সাধনাতে আত্মগোপনতা এবং নিবিষ্টতা।

লেখার থেকেই মাত্র তাঁর তখন বাইরে যা-কিছু পরিচয় ছিল। আধুনিকদের মধ্যে গদ্য-কবিতার সংক্রামকতা নিয়ে কথা হয়। মৈত্রমশায় এ সময় স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ছদ্মনামে গদ্য কবিতার আসরে দেখা দিয়েছেন সম্ভাবনা জাগিয়ে।

১৩৪৮ সন। জ্যৈষ্ঠের সকাল। কবি তাঁর অভ্যাসমতো উদয়ন-গৃহের দক্ষিণ বারান্দাতে সোফায় এসে বসলেন। রোগের কাতরতা এই প্রাত্যহিক রীতিটির কাছে আজো পরাহত। সুদীর্ঘ শুভ্র দেহে বর্ণদ্যুতি ঈষৎ পাণ্ডুর। দূরে দেখা যায়, মেঘছেঁড়া রৌদ্রবিকাশের ক্ষয়ে-যাওয়া খোয়াই ডাঙার মৃদু আরক্ত আভা। সামনের থেকে পাপড়ি-মেলা ফুলগুলোর গন্ধস্রোতে বহমান একটি মিষ্টি আমেজ। মাটির স্নিগ্ধতা দিকে দিকে।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু এসেছেন। কবিকে প্রণাম করলেন। 'কবিতা' পত্রিকার সদ্য প্রকাশিত 'জয়ন্তী সংখ্যা'র কথা উঠল। তারপরে একথা-সেকথার মাঝে বুদ্ধদেববাবু এক সময়ে ধরিয়ে দিলেন তাঁর প্রশ্নটি। বিষয়টা ছিল, 'সাহিত্য সৃষ্টিতে সম-সাময়িক ইতিহাসের প্রভাব'। এর বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছে নানাস্থলেই। একটানা প্রায় ঘণ্টাতিনেক কবি বলে গিয়েছিলেন। শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও। মনে হয়েছিল, অদূরবর্তী কোপাই নদীর কথা। আজ সংকীর্ণখাতে শীর্ণ-ধারায় সে প্রবাহিত, কিন্তু সময় বিশেষে এই নদীই আবার দুর্বার বেগে কলনাদে বান ডাকিয়ে ছুটে যায় দিক্‌বিদিকে, পায় যখন সে বর্ষা-মেঘের ডাক। সেদিন এবং আরো দু-তিন দিন

ধরে এ বিষয়ে কবি যা বললেন, তার মোট কথাটা হচ্ছে—সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাপারে আদিতে লেখকের মনে প্রেরণা থাকাই অপরিহার্য, ঐতিহাসিকতার পটভূমি নয়। প্রেরণা যদি থাকে আর সমসাময়িক ইতিহাস সে প্রেরণার অনুকূল হয়, তবে তা থেকে সাহিত্য-সৃষ্টি হয়ে থাকে; কিন্তু যদি সে-প্রেরণার রসতৃষ্ণা তাঁর কাল না মিটাতে পারে, তবে লেখক একক হয়েও অসাময়িক বিষয়ে সাহিত্যরচনা করে থাকেন। এতে কাল হিসাবে তিনি তাঁর সমসাময়িক লেখকদের জগতে কোথাও বা আগে আগে চলেন, কোথাও চলেন পিছিয়ে, তাতে কিছু যায় আসে না। লেখার কাজ রসসৃষ্টি, তাতে সার্থক হওয়াই হল মূলকথা;—তা, সে যে বিষয়, যে-ভাষা, যে-ভঙ্গি দিয়েই হোক না কেন। সে ক্ষেত্রে সার্থকতা দেখিয়ে বঙ্কিম হয়েছেন সাহিত্যস্রষ্টা, কবি (রবীন্দ্রনাথ) নিজেও তার নিদর্শনস্থল। এবং আজকেও বাংলা-সাহিত্যে সে-দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সাহিত্য সমস্যা মিটাবার জিনিস নয়, সে হচ্ছে নিছক উপভোগের সামগ্রী। অন্য সব কিছু সার্থকতাই তার গৌণ। সাহিত্যের সঠিক পরিচয় দূরকালের রসানুভূতির মধ্যে।

দীর্ঘ এই আলোচনা সূত্রেই সাহিত্যসম্বন্ধে কবির এই মন্তব্যগুলো প্রকাশ পায়। এইটিই ছিল বাইরের লোকের সঙ্গে গুরু বিষয়ে কবির শেষ সাক্ষাৎকার।

'বিচিত্রের দূত' রবীন্দ্রনাথ

"বহুজন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে"

—'জন্মদিনে'

বহুস্থলে বহুজনে রবীন্দ্রনাথের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কবি, ঋষি, বিশ্বপ্রেমিক,—এসব বড়ো পরিচয় তো আছেই, তার সঙ্গে সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পরিচয়ের মূল্যবান আলোচনার অভাব নেই। সম্প্রতি দেখা গেল, 'কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ'—নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবির সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ থেকে কবিকে এ-উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তবু আরো অনেক-কিছু পরিচয়ই তাঁর বাকি থেকে যায়। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য। ১৩৪৮ সনের জয়ন্তী উৎসবের দিনকয়েক পরেই 'উদয়নে' একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। আরেকটি অভিনন্দনের পালা। এবার রাজদরবারের ব্যাপার। কবি অসুস্থ নড়তে-চড়তে অক্ষম। 'উদয়নে'র সম্মুখের বারান্দায় এনে তাঁকে এক সকালে কোনোমতে বসানো গেল। ত্রিপুরাধিপতি পাঠিয়েছেন তাঁর রাজ্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি। রাজার প্রতিনিধি হয়ে শিক্ষাবিদ্ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তী এসেছেন। ইতিপূর্বে ত্রিপুরাধিপতি মাণিক্য বাহাদুরও একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। কবির অতিথি হয়ে 'উদয়নে' ছিলেন। এসব ইতিহাসের যেন শেষ রেখাটি টেনে দিল এই অভিনন্দন-উৎসব। এই অনুষ্ঠানকে ত্রিপুরারাজ স্মরণীয় করে রাখলেন একটি উপাধি নিবেদনের দ্বারা,—কবিকে এবার বলা হলো 'ভারত-ভাস্কর'।

সব নামেরই আলোচনা নানাদিকে হচ্ছে—একটি নাম বাদে। নিজেকে সেটি কবির নিজেরই দেওয়া। নিজেকে তিনি বলেছিলেন—'বিচিত্রের দূত'। এই যে একটি মাত্র পরিচয় তিনি আপনা থেকেই স্বীকার করেছিলেন, আজ অবধি কোথাও তার বিশেষ আলোচনা হয় নাই। বিচিত্র দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনার অভাব যে আজো রয়েছে তা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন।

কবি নানাভাবে সংসারের সঙ্গে মিলেছিলেন। বিচিত্র ধরণের মানুষ এবং বিষয়ও এসে মিলেছিল তাঁর জীবনের চারপাশে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করে তার বিকাশকে যতদূর সম্ভব অব্যাহত রেখে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি সমন্বয়-কেন্দ্র,—তাঁর সাধনার এইটি হচ্ছে বড়ো পরিচয়। তাঁর কথার সঙ্গে অন্য অনেকের কথা জড়িত; এজন্য তাঁদেরও উল্লেখ না করলেই নয়। তাঁর রচনার মধ্যে অন্যদের উল্লেখ যেখানে এসে পড়েছে, তিনি স্পষ্ট করেই তা প্রকাশ করেছেন, গুরুত্ব কখনো খর্ব করেননি। একটি ঘটনা মনে পড়ে। 'শিক্ষা' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ

শান্তিনিকেতন প্রেসে ছাপানো হচ্ছে। কবির দুখানি পত্রও সেবারে তাতে সংকলিত হচ্ছিল। যাঁকে কবি পত্র লিখেছিলেন তার নাম প্রুফে পাদটীকায় অতি ক্ষুদ্র আকারে বসানো ছিল। কবি তা দেখে ঘোর আপত্তি জানালেন। বললেন, এ কী ব্যবসাদারি। কোনো কোনো পত্রিকায় অবশ্য এ-রীতি হামেশাই দেখা যায়। পত্রকে বা কোনো সংকলিত রচনাকে তারা হেডিং দিয়ে নূতন প্রবন্ধরূপে সাজায়। এমন কৌশলে তার অন্য ইতিহাস ঝাপসা করে আড়ালে রাখে যেন লোকের কাছে মনে হয় সেটি কেবল তাদের পত্রের জন্যই আনকোরা লেখা। আমার রচনার বেলায় আমার বইতে তা চলবে না। যাদের নিয়ে আমার পত্রের কারবার, তারাও পত্রের সঙ্গে একটা মর্যাদা বহন করে। তাদের নাম উহ্য রাখা বা ছোটো করে দেখানো চলবে না। তাদেরও স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে। এই বলে নির্দেশ দিলেন, নীচেকার নাম উপরে পাইকা টাইপে পত্রের গোড়াতেই বসাতে হবে। সেভাবেই সে সংস্করণ ছাপা হল।

এর থেকে বোঝা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উল্লেখের তাৎপর্য ও প্রয়োজন কবি এক সময়ে বিশেষভাবেই অনুভব করেছেন। কিন্তু একথাও সত্য যে, সময়ান্তরে অনেক গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রের বেমালুম লোপও ঘটেছে তাঁর জীবিতকালেই। তবে তার হয়তো অন্য অনেক কারণ আছে। 'বিচিত্রের দূত' সংসারের তুচ্ছতম বিচিত্র উপকরণকে মূল্য দিতে শেষজীবনে

আরো বেশি উন্মুখ হয়ে উঠেন। তাঁর তখনকার কাব্যের বাণীই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মানুষের শক্তি তার বৃত্তির ক্ষেত্রেই যে শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে, কিংবা তার পরিচয় যে একটিমাত্র কোনো বিশেষ দিক দিয়েই পরিস্ফুট হবে, এরূপ সংকীর্ণতার আঁটাআঁটি কবির কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। মানুষের শক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশই তিনি চেয়েছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সেরূপ আয়োজনই তিনি করেছেন। কিন্তু যেখানে মাইনে দিয়ে কাজ করাবার ও তা বুঝে নেবার ব্যবস্থা, সেখানেও মানুষের এই সর্বাঙ্গীণ স্বাধীন বিকাশের প্রতি তাঁব সহানুভূতি ও সহায়তা কতদূর ছিল, তা একটি দেখবার বিষয়। কবির স্বভাবের খাঁটি পরিচয় সে ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে বিশেষরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। কিছু কিছু নিজস্ব প্রতিভা নিয়ে যাঁরা কাছে এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের প্রতিভা স্ফুরণে কবির আনুকূল্য তো লাভ করেছিলেনই, এ ছাড়া নানাদিকে আরো কতজনে যে তাঁর সক্রিয় সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছেন তার শেষ নেই। সেই আনুকূল্য দানে কোনো কার্পণ্য ছিল না, ছোটো বড়ো বিচার ছিল না। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কবিব কয়েকটি অনুল্লেখিত ছোটো খাটো বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে। এককালে একরূপ হাতে-ধরে তিনি আশ্রমের বড়োদের মধ্যে লেখক সৃষ্টি করেছিলেন। একালেও অনেককে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, পরিশ্রম মানেন নাই। তা

থেকে তাঁর পাঠভবন শিক্ষাভবনের বালখিল্যেরাও বঞ্চিত হত না। কিন্তু কেরাণী মহলে উৎসাহ ছিল কম। প্রেসের বৃদ্ধ ম্যানেজার শ্রীকালাচাঁদ দালাল তাঁর রচনা নিয়ে কবির কাছে অগ্রসর হয়েছেন, আশীর্বাদও পেয়েছেন। একবার আর-একটি লোক নিয়ে গেলেন লেখা। কবি দেখে দিলেন সংশোধনও করে দিলেন। এতখানি তাঁর আলো পড়েছিল আনাচে-কানাচে। কিন্তু কেরাণীর কবিত্বের দৌড় আর কতদূর হবে। উত্তরায়ণের চৌমাথায় অপরাহ্নে ভ্রমণ-রত কবি। কী ভেবে যে তাকেও আশীর্বাদ করেছিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু বলেছিলেন,—হবে. তোমার হবে। সেই বাণী বা এই সংশোধনের উৎসাহও লোকটির মনে বেশি ভরসা জাগাল না। অযত্নে রচনার খাতাটি তার নষ্ট হয়, লোপাট হয় সংশোধন ভরা পাতাটিও। দুএকটি রচনা তার অন্যত্র কপি করা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তারই মধ্যে সেই সংশোধিত লেখাটির একটি পাঠ মেলে। সেটি হচ্ছে এই ঃ

সখি, কী যেন দেখেছি কবে।
আনজনে কি তা বুঝানো যায় গো
শুধু বুঝি অনুভবে।
সে নহে তোমার চারু-বেশবাস
নহে কালো এলো কুন্তলপাশ,
ভ্রমর-চপল নয়নও সে নহে
কে বলিবে সে কী তবে!
কথার গাঁথুনি ব্যথা হানে বুকে
বুঝাবারে যাই যবে।

এর পরের অর্ধাংশ কবির যোজনা :—

ছুঁইনি যে ফুল গাঁথিনী যে মালা,
পরি নাই যারে গলে,
ফাগুন-বাতাসে যার আশা ভাসে
কম্পিত বনতলে।
অমরাবতীর মানস-কাননে
কুঁড়িগুলি যার কাঁপে খনে খনে,
সুর-বালিকার বেণীর বাঁধনে
চরম বিরাম লভে
তারি মতো তুমি আমার স্বপনে
বিরাজ সগৌরবে।

আরেকটি কবিতা তাঁকে দেখানো হয়। সেটি ছিল চব্বিশ মাত্রার পয়ার। রচনাটি কবি অনুমোদন করেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই অভিমত জানান যে, আঠারো মাত্রার বেশি লম্বা ছন্দের পয়ার সাধারণত না লেখাই ভালো। তাতে রস-ধারার বেগ শিথিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। উক্ত রচনাটি 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। আরেকবার একটি কাব্যসংকলন গ্রন্থে কবি নিজে থেকে আগ্রহ করে তাঁর কর্মীদের কারো কারো কবিতা সংকলিত করেন। অন্য অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত কবিদের রচনা যে গ্রন্থে অনুল্লেখিত রয়েছে, সে গ্রন্থে প্রায় অজানা কর্মীদের কবিতা প্রকাশ, একদিক দিয়ে সমালোচনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু সে দায় তিনি জেনেশুনেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রকাশ-

যোগ্যকে তিনি রচনার পরিমাণ বা নামের বহর দিয়ে যাচাই করেন নি; হাতের কাছের কাব্যটুকুরাও সেদিন তাঁকে উৎসাহী করেছিল। অধীনস্থদের এরূপ প্রকাশ্য সমাদর, এরূপ সুযোগ দান ও উৎসাহ প্রদর্শন রবীন্দ্র-চরিত্রের উদারতার পরিচয় বহন করে। তিনি শুধু কবি, তিনি বিচিত্রের দূত, বাণীর মধ্যেই কেবল তিনি বিচিত্রের পরিচয় দিয়ে যাবেন, এই নাকি তাঁর কাজ; কিন্তু কেবল বাণীতে নয়, তাঁর স্নেহার্দ্র অন্তরের প্রেরণায় নানা ঘটনায় নানা লোকের সঙ্গে মিলে তিনি তাঁর আরো সব দিক দিয়ে বিচিত্রের যে পরিচয় প্রকাশ করেছেন, সে সব ছোটোখাটো উপলক্ষগুলি মিলিয়ে দেখলেও পরিমাণে ও প্রকারে তা নেহাৎ অল্প হবে না।

আশ্রমের গুরুপল্লীতে ছেলেমেয়েরা হাতেলেখা পত্রিকা বের করত—'হাতেখড়ি'। ১৯৩৫ সনের জানুয়ারিতে একবার তাদের গুটিকয়েক মিলে গুরুদেবকে গিয়ে ছেঁকে ধরলে,—কি না, তাদের 'হাতে-খড়ি'-তে গুরুদেবেরও হাতে-খড়ি দিতে হবে। এই একটু যা-তা লেখা আর-কি! দলের পাণ্ডা ছিল 'ভুন্নু' ওরফে শ্রীমান সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশায়ের বড়ো ছেলে। কবি বললেন, দেব লিখে, রেখে যা ঐদিকে।—টেবিল দেখিয়ে দিলেন। পরদিনই আবার ছেলের দল পরম উৎসাহের সঙ্গে গিয়ে হাজির। খাতাটি নিয়ে সবাই বেরিয়ে এল।

দেখল ফল মিলেছে। নির্দিষ্ট পাতাটিতে গুরুদেবের বাঁকা আঁখরে লেখা রয়েছে,—

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
লিখতে তখন পারি আমি হয়তো,
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয়তো।

বহুপূর্বের যে কবি আশ্রমবাসীদের মধ্যে অনেককে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিয়ে কিরূপে হাতে ধরে শিখিয়ে তাদের ভিতরকার গুণীকে স্রষ্টাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন, তার একটি উদাহরণ এবারে এখানে দেওয়া যাচ্ছে। কবির জীবনীকার প্রভাতবাবু আশ্রমের একজন বিশিষ্ট কর্মী; বহুদিন থেকেই গ্রন্থাগারের ভার তাঁর উপরে অর্পিত আছে। যে সময়কার কথা, তখন তাঁর বিবাহ হয়েছে কিছুদিন মাত্র। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী শুধু উচ্চ শিক্ষিতাই নন, সাহিত্যেও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। সে-সময় সুধাদেবী একবার ইংরেজী সাহিত্য থেকে শিশুদের উপযোগী একটি গল্পের বঙ্গানুবাদ করেন। আশ্রমের আয়তন এত বড়ো ছিল না তখন। গুরুদেবেরও চলে-ফিরে দেখবার অভ্যাস রীতিমতোই রয়েছে। সকলের খোঁজ-খবর নেন, মেলামেশা করেন নিজে গিয়ে। সব দিক দিয়ে তাঁকে আশ্রমের প্রত্যেকেই কাছে পায়; কারো কোনো সংকোচের কারণ ছিল না। তাই আশ্রম-পরিবারের একটি

বধূও সাহস করে তাঁর কাছে নিয়ে ধরেছিলেন নিজের লেখাটি। অনুবাদটি ছিল দীর্ঘ। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, প্রথমে কবি দুএকস্থলে সংশোধন করে সারবেন বলেই যেন হাত লাগিয়েছিলেন। লেখাটির প্রতি কবির উৎসাহ ও যত্ন যে কিরূপ আন্তরিক ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে, প্রথম পাতার পরেই গল্পটির নূতন করে লিখে-দেওয়া অর্ধাংশে। পাতার পর পাতা পাশেপাশে কবির হস্তাক্ষরে পূর্ণ। লেখার সঙ্গে লেখিকার প্রতিও কবির স্নেহ তাতে সুব্যক্ত। কবির লিখিত অংশটুকু এই :

"নীল সাগরের পারে এক ছিল রাজপুত্র। ভাল ভাল সব তীরন্দাজ ছিল তার নফর। তারা রোজ বন-বাদাড় ঘুরে মেরে আনত তিত্তির, ময়ূর, পায়রা, রাজহাঁস আরো কত কী পাখী। সে পাখীর মাংস না হলে রাজপুত্রের খাওয়া হত না।

সেই তীরন্দাজদের মধ্যে ফকির ছিল সবচেয়ে চালাক। সে কেবল আওয়াজ শুনে চোখ বুজে পাখী মারতে পারত। তাই তার পরেই রাজপুত্রের বড়ো ভালবাসা।

একদিন সে ভোরবেলায় গেছে শিকার করতে। দেখে তেঁতুল গাছের ডালে বসে আছে একটি ঘুঘু। পায়ের শব্দ শুনে পাখী যেমন ডানা মেলে উড়েছে ফকির তার ডানায় মারলে তীর—অমনি ঘুঘু মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে এসে পড়ল। ফকির তাকে ঘাড় মট্‌কে ঝুলির ভিতর পুরবে এমন সময় পাখীটা কথা কয়ে বলে উঠল—'ভাই শিকারী, আমাকে

আজব দেশের আজব কাণ্ড।

ছিল সাত শ' বছর আগের এক রাজপুত।

[illegible] ভাল বাসতেন; [illegible] মাংস খুব ভালবাসতেন [illegible] না খেলে হতনা। [illegible] খেতে না পারত এই সব শিকারীরা [illegible] বনবাদাড় ঘুরে সুন্দর সুন্দর পাখী মেরে আনত;

[illegible]
ভাল ভাল সব শিকারী ছিল তার সঙ্গে। তারা কত বনবাদাড় ঘুরে মেরে আনত, তিতির, ময়ূর, পায়রা, রাজহাঁস, আরো কত কি পাখী। সেই পাখীর মাংস না হলে রাজপুত্রের খাওয়া হত না। সেই শিকারীদের মধ্যে একজন ছিল সব চেয়ে ওস্তাদ। সে কেবল [illegible] কোন রকম পাখী মারতে পারত। সেই ছিল রাজপুত্রের বড় আদরের।

সেই সব পাখীর মাংস না হলে রাজার ভাল করে খাওয়াই হত না। শিকারীদের মধ্যে ফকির বলে একটি খুব চালাক ছেলে ছিল — লক্ষ্য তার একেবারে অব্যর্থ — যেদিকে লক্ষ্য করে সে তীর ছুড়ত ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে তা বিঁধত—

যেরো না, আমাকে ঘরে নিয়ে চল।' ফকির মনে ভাবলে 'তাই ত, কথা কয় এ কেমন পাখী?' তাকে শুধোলো, 'তুমি বনের পাখী, তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে করব কি?' পাখী বললে, 'তোমার ঘরে আমায় বসিয়ে রাখবে, যখন দেখবে আমার ঘুম এসেছে আমার ডানায় হাত বুলিয়ে দিয়ো।' ফকির বললে, 'তোমার ডানায় হাত বুলিয়ে দেব তাতে আমার হবে কি?' পাখী বললে, 'এখন বলব না, সে তুমি দেখতে পাবে।' ফকির বললে, 'আচ্ছা, ভাল কথা, তবে ঘরে চল।' এই বলে তাকে ত ঘরে নিয়ে গেল। দিন কেটে যায়, সন্ধে হয়ে আসে। ফকির এসে দেখে পাখীর ঘুম এসেছে, মনে পড়ল ওর ডানায় হাত বুলতে হবে। একবার দুবার তিনবার যেমনি হাত বুলোলো অমনি কোথায় বা পাখী কোথায় বা কে। দেখে একটি মেয়ে পরমা সুন্দরী, দুধে আল্‌তায় রং, তার মাথার চুল ভূঁয়ে লুটিয়ে পড়েচে। ফকির ভাবলে এমন রূপ ত দেখিনি, একেই আমি বিয়ে করব।

বিয়ে ত হল, দুজনে সুখে ঘরকন্না করে। কিন্তু কন্যের বড় দুঃখ যে তার স্বামী রোজ সকালে শিকার করতে যায় আর সন্ধেবেলায় ঝুড়ি ঝুড়ি পাখী মেরে আনে।—একদিন তাই সে ফকিরকে ডেকে বললে, 'তুমি এক কাজ কর।'

ফকির বললে, 'কী করতে হবে?'

কন্যে বললে, 'তুমি হাটের থেকে পাঁচ সের রেশম কিনে আন।'

ফকির বললে, 'রেশম কিনে এনে কি হবে?'

কন্যে বল্‌লে, 'এখন বল্‌ব না, সে তুমি দেখতে পাবে।'

ফকির সেদিন আর শিকারে গেল না। একেবারে চলে গেল হাটে। সন্ধেবেলায় এক ঝুড়ি রেশম এনে তার বৌয়ের কাছে দিল, বল্‌লে, 'এই নেও তোমার রেশম, কি করবে কর।' বউ বল্‌লে, 'আচ্ছা বেশ, সে তোমাকে ভাবতে হবে না; তুমি ঘুমোও গে।'

ফকিরও গেল ঘুমতে। সে যেমনি বিছানায় শোয়া অমনি রাজ্যির ঘুম যেন তাকে চেপে ধরল।

এদিকে কন্যে তার ঝাঁপির ভিতর থেকে এক পুঁথি বের করলে। মন্তর পড়ে তার সাত ফের কাপড় খুললে, তার পরে যেমনি পাতা খোলা অমনি আধ হাত প্রমাণ দুটি বামন এসে তার সামনে হাজির।

তারা বল্‌লে, 'কন্যে, আমাদের কি করতে হবে, হুকুম কর।'

কন্যে বল্‌লে, 'এই নাও এক ঝুড়ি রেশম। এখনি আমাকে আসন বুনে দেও তাতে এই মুল্লুকের যেখানে যা কিছু আছে সব আঁকা থাকবে।'

বামন দুটো বল্লে, 'এ আর শক্ত কি?'

এই বলে বসে বসে আসন বুনে দিলে; তাতে হাতীর ছবি, ঘোড়ার ছবি, মানুষের ছবি—তাতে হাটের ছবি, ঘাটের ছবি, মাঠের ছবি—তাতে কত রাজবাড়ি, কত দেউল, কত বাগান।

কন্যে বললে, 'বেশ হয়েচে।' বলে পুঁথির পাতা যেমনি বন্ধ করলে অমনি দুটি বামন কোথায় চলে গেল আর দেখা গেল না।

রাত ত গেল কেটে। সকাল বেলায় ফকির যখন ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌ল কন্যে তার কাছে আসন নিয়ে গিয়ে বললে, 'এই নাও। এই আসন বাজারে বেচে এস গে।'

ফকির বললে, 'আচ্ছা বেশ। কিন্তু আমি ত এর দাম জানিনে। কত দাম চাইব?'

কন্যে বললে, 'যে যা দাম দেয় তাই নিয়ো।'

ফকির বললে, 'আচ্ছা।'

এই বলে আসন নিয়ে সে গেল বাজারে। সেখানে তার আসন যে দেখে সেই বলে এমন আসন ত কোথাও দেখিনি।

তারা জিজ্ঞাসা করে, 'এর দাম কত?'

ফকির বলে, 'এর দাম ত আমি জানিনে।'

কেউ দাম ঠিক করতে পারে না, চলে যায়। ফকির মনে মনে ভাবে, এ ত ভাল আপদে ঠেকেছি। দিন বয়ে গেল, কোনো কাজ হল না।

এমন সময়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে মন্ত্রীর পুত্র। সে বল্লে, 'এখানে কি বিক্রি হয়?' বাজারের সব লোক বললে, 'ফকির এক আসন বেচতে এসেচে, এমন আসন সহরে কোথাও মেলে না।'

মন্ত্রীর পুত্র বললে, 'সত্যি নাকি? দেখি কেমন আসন?'

আসন দেখে মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, 'এ আমি কিন্‌ব। এর দাম কত ?'

ফকির বল্‌লে, 'এর দাম যে কত সে আমি বল্‌তে পারিনে।'

মন্ত্রীর পুত্র আপন গলা থেকে গজমোতির হার আর পাঁচ আঙুল থেকে পাঁচটা হীরের আঙটি খুলে নিয়ে বল্‌লে, 'এই নাও তোমার আসনের দাম।'

মন্ত্রীর পুত্র আসন নিয়ে রাজার সভায় গিয়ে উপস্থিত। রাজা আসন খুলে দেখে, তাতে তার সমস্ত রাজ্যের চেহারা।

রাজা বল্‌লে, 'কত দাম নেবে বল, এ আসন আমি কিন্‌তে চাই।'

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, 'এ আসনের দাম কত সে কথা আমি বল্‌তে পারিনে।'

রাজা তখন তার দশ আঙুলের দশ আঙটি খুলে দিলে, আর দিলে, তার গলার হারে সাত রাজার ধন যে মানিক ঝোলানো ছিল সেই মানিক।

মন্ত্রীর পুত্রের লোভ হল। সে ভাবলে, ফকিরের ঘরে এমন আসন আরো যত আছে সব আমি কিনে আনব।

এই বলে সে গেল ফকিরের বাড়িতে।

গিয়ে দেখে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ঘর আলো করে বসে আছে। মনে মনে ভাবলে, এমন সুন্দরী ত দেখিনি কোথাও। রাজাকে খবর দিয়ে আসি গে তাহলে বখ্‌শিষ মিলবে।

রাজাকে গিয়ে বল্‌লে, 'ফকিরের ঘরে এক মেয়ে দেখ্‌লুম যেন দেবকন্যা, রূপ তার ধরে না।'

রাজা বল্‌লে, 'আমি তাকে রাণী করব।'

অনুবাদটিতে এর পরে আর কবি এগোননি, এখানেই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন।

কবি বলতেন, ঘটনা এবং বেদনা এই দুয়ের ওতঃপ্রোত সমাবেশেই দাঁড়ায় গল্প। ঘটনার প্রাধান্যে রচনা চলে সাংবাদিকতার দিকে, আবার বেদনার বাড়াবাড়িতে হয়ে ওঠে তা কাব্যিক। এর কোনোটাই কথা-সাহিত্যের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। দুয়ের ভারসাম্যের উপরেই নির্ভর করে তার সিদ্ধি।

টুকিটাকি এরকম সব রচনা সংশোধনের কাজ কবি চিরদিনই চালিয়ে এসেছেন। অনেকের কাছেই এরূপ নিদর্শন নিশ্চয়ই আছে। কবি এগুলিকে নিত্য-অভ্যাসের উপরি বিষয়রূপে হেলাফেলা করে ছড়িয়ে পড়তে দিয়েছেন; যাঁরা তাঁর এসব লেখা পেয়েছেন, তাঁরাও নিজেদের বিষয় বলে এসবের রক্ষায় সব সময় তত উৎসাহী ছিলেন না, কিংবা, এসব রচনা প্রকাশের কাজে এখনও তেমন অগ্রবর্তী হননি। এদিকে যত্নেরও অভাব না আছে এমন নয়। কিন্তু তাঁদের সংকোচের চেয়ে বা মালিকানা গৌরবের চেয়ে বড়ো কথা এগুলি কবির জিনিস। তাঁর রচনা বা যেকোনো সৃষ্টির পরিচয়ের সামান্য উপকরণও বিশেষ কারণ ব্যতীত

অপ্রকাশিত রাখা আজ নিতান্তই অনুচিত। এই যুক্তিতেই সুধাদেবীর কাছ থেকে তাঁর সংকোচের বাধা ঠেলে এ রচনাটুকু আদায় করা হয়েছিল, এবারে তা সকলের কাছে প্রকাশ করা গেল।

উপরোক্ত রচনাটির সন্ধানসূত্রে একই গৃহ থেকে গুরুদেবের আরেকটি লেখা মিলল। গৃহকর্তা প্রভাতবাবুরই বাইশ বছরের জন্মদিনে আশীর্বাদীস্বরূপ কবি লিখে পাঠিয়েছিলেন :—

প্রভাতের পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ :—
নূতন জনমে নব নব দিন
তোমার জীবন করুক নবীন,
অমল আলোকে দূরে হোক্ লীন
রজনীর অবসাদ।

১১ই শ্রাবণ
১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

পূর্বের অনুবাদ-গল্পটির সঙ্গে এটিও আজ উদ্ধার করা গেল।

কবির একটি পরিকল্পনা ছিল লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা বের করবেন। বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকরা তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ লেখবার ভার পান। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ভার পড়ে অধ্যাপক শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনের উপর। তাঁরও পাণ্ডুলিপি কবির দপ্তরে এল। বহুস্থলে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করবার জন্যে কবি স্বহস্তে তাতেও পাতার পাশেপাশে নূতন

নূতন করে অনেক অংশ লিখে দেন। কিন্তু নানা কারণে আজ পর্যন্ত সে রচনা অপ্রকাশিত অবস্থায় গ্রন্থকারের কাছেই রক্ষিত রইল। কবির লিখিত একটি তার অপ্রকাশিত অংশ এইরূপ :

"আলাদা আলাদা করে ধরলে জন্তুরা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট সময় বাঁচে তারপর মরে কিন্তু যে প্রাণধারা তারা বংশাবলীর মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দেয় তার আর অন্ত পাওয়া যায় না। আমরা আজ যে বেঁচে আছি কোন অতি পুরাকালের আদিবংশের মধ্যে তার আরম্ভ তার গণনা করবে কে? গাছপালারাও ফুল ফল বীজের নানা রাস্তা দিয়ে আপন বংশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক ঘাসের প্রত্যেক সামান্য গাছের সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ধারা যে কত দীর্ঘ তার ঠিকানা নেই। কিন্তু প্রাণধারণের প্রণালীতে তফাৎ দেখতে পাই জন্তুর সঙ্গে গাছপালার।

(উদ্ভিদ পরিচয়)

তেজেশবাবু কবির প্রিয় ছিলেন। চায়ের টেবিলে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক পড়ত। তাঁর কাছে জানা যায়,—দেশের সামান্য বিষয়গুলিও কবি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন। ব্যবহারযোগ্যতা ও শোভনতার দিক দিয়ে যাচাই করে তুচ্ছ বিষয়কেও কাজে লাগাতে তাঁর ঔৎসুক্য দেখা যেত।

একবার চায়ের টেবিলেই কথা হয়, সকালের জলখাবারে দেশীয় ধারায় জলভাত বা সাদা কথায় পান্তাভাত প্রচলন করা চলে কিনা। স্বল্পব্যয়ের জিনিস, ঘরে-ঘরেই তো চলে

থাকে। পুষ্টিকর অথচ স্নিগ্ধ, বীরভূমের মতো শুকনো অঞ্চলে আরো উপযোগী হবে। দোষ কী। কবি নিজেই চায়ের টেবিলে দুতিন দিন অন্য খাবার বাদ দিলেন, লেবু ও নুন যোগে ভাতের জলকে সরবতের মতো খেয়ে নিলেন। তেজেশবাবুও তা খান; এমন কি একদিন ক্ষিতিমোহনবাবুও নাকি তা পরীক্ষা করলেন।

তখনো কবি উত্তরায়ণবাসী হননি। থাকেন 'দেহলি'তে। এদিক-সেদিক দেখে শুনে বেড়ান। পথে-ঘাটে ফুটে আছে ঘাসফুল। লাল নীল—মাঠ ভর্তি। মণি-মুক্তা হার মানে। কবির মন গেল, এগুলির কেন যত্ন হবে না। বিলিতী মরশুমী ফুল, কত তার আদর। পয়সা দিয়ে কেনা। তাদের কাছে এদের শোভা কী কম! ছোটো ছোটো কাঠের বাক্সে মাটির চৌকোয় সেগুলি সংগ্রহ করলেন তেজেশবাবু; শোভা পেল মেঠো ফুলে কবির 'দেহলি'।

২৫শে বৈশাখ। ১৩৩৮ সন। শান্তিনিকেতনে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব। বিরাট আয়োজন। আমবাগানে সভা। আগের দিন থেকে আলপনায় আম্রপল্লবে পুষ্পেপত্রে ঘটে বিবিধ উপচারে উৎসবস্থল সুসজ্জিত। রাত্রের ঝড় বৃষ্টিতে সব আয়োজন পণ্ড হয়ে গেল। পরদিন অতি প্রত্যুষে আবার নূতন করে সব সাজাতে হল। কবির বাণী শুনতে সকলে উৎসুক। সভায় 'প্রণাম' (অর্থ কিছু বুঝি নাই), 'জন্মদিন' (রবি প্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের আবর্তন), এবং 'পান্থ' (শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা)—এই তিনটি

কবিতা আবৃত্তি করে কবি সকলের চিত্ত ভরে দেন। আবৃত্তির পূর্বে তিনি বলেন :

"এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোক-রশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন. আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমি নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি; যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর, আমরা তাঁরি দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখিনে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে, তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইত আমার একমাত্র পরিচয়। অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন; কেউ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুল-মাস্টারের পদে বসিয়েছেন।··· এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলা-সহচর। ···যাঁরা আমাকে উচ্চমঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি,

আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।"

'বিচিত্রিতা' নামে রবীন্দ্রনাথের একখানি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। কবির সত্তর বৎসর বয়সে লেখা। ১৩৪০ সনের শ্রাবণে প্রকাশিত। তার প্রত্যেকটি কবিতা এক-একজন আধুনিক ভারতীয় শিল্পীর চিত্রদ্বারা অলংকৃত। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে কবি বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করে আশীর্বাদ করেন। উৎসর্গ-পত্রের প্রারম্ভে লেখা আছে—'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।' এই কাব্যখানির পাণ্ডুলিপিতে আরো অনেক বিচিত্র ধরণের কবিতা ছিল। আকার বড়ো হয়ে যায়, তাই প্রথম ও দ্বিতীয় ছুটি খণ্ডে ভাগ করে কাব্যখানির প্রকাশের কথা হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ হল না। সে কবিতাগুলি নিয়ে 'বীথিকা' কাব্যের ফাইল তৈরী হতে থাকে। বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায় 'বীথিকা' গ্রন্থটি তাই রবীন্দ্র-কাব্যমালার মধ্যে অনন্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ কবি, বিচিত্র-রসের কবি। তাঁর বাণীতে রয়েছে বিচিত্রের কথা, কাজেও তাঁর বিচিত্রের

পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। টুকিটাকি সে বিচিত্র জীবন-কথার কিছুই ফেলবার নয়।

তখন কবি বাস করছেন 'পুনশ্চে'। কবিতা নয়, কবির কলমে আঁকা চলেছে ছবির পর ছবি। ছবিগুলি ভারি মজার। ভর্তি হয়ে পড়ে আছে দুখাতা। এদিকে কাব্য 'খাপছাড়া' প্রেসে গেছে। 'সে' বইর কবিতাগুলিও অদ্ভুতরকমের। প্রস্তাব করা হল, প্রত্যেকটি কবিতাকেই ঐ আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো চাই। কবি বললেন—এ তাঁর নূতন বিদ্যা। আনাড়ির পরিচয়কে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিত করা নিরাপদ নয়। কিন্তু তিনি আপত্তি করে সুবিধে করতে পারলেন না। 'সে' এবং 'খাপছাড়া' দুটি বই-ই ভরে উঠল তাঁর নিজের চিত্রালংকারে। অনেক নূতন ছবি এবং কবিতা পরস্পরের পরিপূরকরূপে তৈরী হয়ে উঠল। সেই থেকে বই দুখানি প্রকারান্তরে রবীন্দ্র-চিত্রশিল্পের এলবাম্-এর কাজ করছে। অথচ এই ছবিগুলি ছাপাতে একদিন তাঁর কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন চরম আনাড়ি একজনের আগ্রহকে সস্নেহে কবি মূল্য দান করেছিলেন।

এবারে গানের কথা। গীতবিতানের সুর-না-দেওয়া গানের তালিকাটি রেখে দেওয়া ছিল কবির টেবিলে। যখন মনে হত, সুর বসাতেন। একদিন এরূপ সুর দেওয়া হয়েছে। দুপুর বেলা। অসময়,—গানের লোক অন্য কেউ নেই কাছে। আপিসেরই একজনকে ডেকে নিয়ে 'কোনার্কে'র বারান্দায় সিঁড়ির উপর বসেই কবি শেখাতে লাগলেন—

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো
আমার দখিন হাতে।
সূর্য যেমন ধরার পরে
আলোকরাখী জড়ায় প্রাতে।

দুঃখের বিষয় সুরটি কবিও যেমন ভুলে যান, অপরজনাও তেমনি ভুলে গিয়েছিলেন। নূতন করে আবার শেষে সেটিতে কবি সুর সংযোগ করেন। শেষদিকের একটি বর্ষা-সংগীতের স্বরলিপি তৈরী ও তা প্রকাশের অধিকারও কবি দান করেন তাঁর আপিসেরই এক কর্মীকে। সেই স্বরলিপিসহ গানটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

আপিসের কাজের ফাঁকে-ফাঁকেই কবিকে আমার দেখা। কাজেই আপিসের খুঁটিনাটি আমার কথার ভিতরে ঘুরে-ফিরে আসবে, তা স্বাভাবিক। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে নানা ঘটনার উল্লেখ করে বলব তাঁর চরিত্রের বিচিত্র-কথা।

মজা হয়েছিল। 'উদয়নে'র খাবার ঘর। দুপুরে কবি খেতে বসেছেন। আপিসে সবাই কাজ করছি। একজনের তলব হল। কবির কাছে অভিযোগ এসেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে। অভিযুক্ত ব্যক্তি নতমস্তকে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। নিজের অপরাধের বিষয় সে শুনল। এখন প্রকৃত ঘটনা কবিকে বোঝানো দরকার। কাগজ পত্রাদি আনতে হবে। ফাইল রয়েছে আপিসে। সে কিছুক্ষণের সময় চাইলে। অনুমতি মিলল। ঘর থেকে বেরুবে, শুনতে পেলে কবি জনান্তিকে বলছেন তাঁর পাশের লোকদের—হুঁশিয়ার আছে।

নজির না রেখে কাজ করে না।—কিন্তু নজির যখন আনা হল, কবির উৎসাহ গেল উবে। বললে—'ও সব দেখাতে হবে না, যাও এবার, কাজ করো গে।' ফাইল-হাতে সে-ব্যক্তি ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে যে, কবি বুঝেছেন, সে নির্দোষ। কবির প্রসন্নতাও তখন ফিরে এসেছে। বহুদিনের কর্মী। সে জানে কথার পিঠে কথা ঠিকমতো জুড়তে পারলে কবির কাছে কথার মার নেই। মরি-বাঁচি করে সে বলেই ফেললে, গুরুদেব, অভয় চাই। জন্মে এ সুযোগ মেলবার নয়। তাই বলে নিচ্ছি। ছোটোবেলা থেকে জেনে আসছি—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

—আপিসের কাজে অন্যায় কিছু করেছি কিনা আপনি দেখলেন, অন্যায় কোন্ দিকে তাও আপনার বুঝতে বাকি নেই, এখন অন্যের সে-অন্যায় সয়ে আবার কারো ঘৃণার দাহে পুড়ে মরব না তো!

কবির চোখের কোণ কুঞ্চিত হল। কিন্তু কৃত্রিম কোপের দৃষ্টি কবির চাপা-হাসির রেখাকে চেপে রাখতে পারল না। ধমক দিয়ে উঠলেন—যাও, হয়েছে।—অভিযুক্ত সে-ব্যক্তি খালাস পেয়ে তার আগেই সরে পড়েছে। উপরোক্ত পদ্যপংক্তিদুটির লেখক রবীন্দ্রনাথ, সেকথা সকলেই জানেন। তাঁর কথার নজির তাঁরই এজলাসে শুনিয়ে উলটো তাঁর কাছেই বিচার-চাওয়া! অন্য কেউ হলে হয়তো বেয়াদবি

বলেই ভুল করত। কিন্তু লোকটির কথার উদ্দেশ্য রসিক রবীন্দ্রনাথের অগোচর ছিল না। কথাগুলি সেও অবাধে বলতে পেরেছিল, রবীন্দ্রনাথও শুনেছিলেন। এর পরেও বেয়াদবির দায়ে লোকটির সাজা হয়নি। কবি ছিলেন এমনি ধৈর্যশীল, এমনি রসগ্রাহী সহজ মানুষ।

আরেকবার কবির আরেক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল এই আপিস-মহলেই। পূজার ছুটির পূর্বেই একটি জরুরি কাজ সারতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনমতো অবকাশ নেই। কাজটি এমনি সঙ্গীন হয়ে এসে চাপল একজনের স্কন্ধে। দিনরাত করেও কূল পাওয়া গেল না। ছুটির আগে আশ্রমে নানা উৎসব হচ্ছে। সকলে আনন্দে মত্ত। সে আছে আপিসে বদ্ধ। রাত দশটা বাজে, এগারোটা বাজে। ঘরের পাশেই থাকেন গুরুদেব। একদিন দেখলেন, দুদিন দেখলেন। পরদিনই আদেশ হল। সময় দিলেন বাড়িয়ে। পূজার দিন। বেচারা হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পেল।

তিনি লিখেছিলেন, সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে বিচিত্রের বিচিত্র রসের প্রবাহ নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে, তার বাহন হওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ,—এতক্ষণে এই বিচিত্রদিকের সামান্য সব ঘটনার আলোচনা থেকেও, আশা করি, কবির উক্তির সার্থকতা কিছু বোঝা যাবে। তিনি যে লিখেছিলেন, 'আমি নাচি নাচাই',—সত্যি, তাও প্রত্যক্ষ করা গেছে।

শেষবার 'রাজা' অভিনয়ের মহড়ার সময় 'উত্তরায়ণে' দিনের পর দিন সন্ধ্যায় কবি সকলকে পাঠ শেখাচ্ছেন, গান গাইছেন সকলের সঙ্গে। পথিকদের দৃশ্য এলে তিনি অভিনেতাদের বললেন, শুধু গাইলে হবে না, নাচতে হবে। দলের মধ্যে দুএকজন স্বাভাবিক পটুতায় সাড়া দিল, কিন্তু আনাড়িদের আড়ষ্টতা আর ভাঙে না। কিন্তু কবিও ছাড়বেন না। গাইতে গাইতে নিজে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন, নেচে দেখাতে লাগলেন—গ্রামের লোকের উৎসবের নাচ। চারিদিকের হাসিকৌতুকের মধ্যে সে-দৃশ্যের সকলকেই তখন চাল-চলনে নাচের ভঙ্গি কিছু-না-কিছু আনতেই হল। তাঁর দৃষ্টি এড়াবার জো ছিল না। কিন্তু খবরদারির দরকার হয়নি। আনন্দময় তাঁর সঙ্গই উল্লাসে সকলকে শেষে নৃত্যেগীতে মাতিয়ে তুলেছিল। নাটকে তিনি ছিলেন ঠাকুর্দা। গান করতেন—

যা ছিল কালো ধলো
রঙে রঙে রাঙা হল

—নাচতেন, নাচাতেন।

কবি লিখেছেন, 'হাসি হাসাই'।—তাঁর কথা হঠাৎ হাসির ফোয়ারা ছুটাত যত, তার চেয়ে বেশি ভিতরে ভিতরে লোককে হাসিয়ে মারত; বহুদিনের হাসির জোগান ছিল তার বৈশিষ্ট্য। কবির সামনে বেসামাল হওয়া যায় না,—সে বিবেচনাই ঘটাত মুশকিল। হাসিঠাট্টা রসিকতায় প্রতিপক্ষের প্রতি তাঁর শরাঘাত সোজাসুজি ছিল না।

কথায় আড় রেখে বলতেন। সেটুকু বুঝে নিতে বুদ্ধি না খেলিয়ে উপায় ছিল না। বুঝে নিলেই কুপোকাৎ। তিনি যেন অপেক্ষাই করতেন ঐ দেখবার জন্যে।

বেশি লোকের মধ্যে, তাঁর নাটকগুলির মহড়ার সময় জনতার দৃশ্যেই মজা জমত। গ্রাম্যলোকদের হালচাল কথাবার্তায় তাঁর বাচন, ভাবভঙ্গি ছিল অনুপম। 'তপতী' 'রাজা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'তাসের দেশ', 'গেছো বাবা' ও 'বিনিপয়সার ভোজ' প্রভৃতির পাঠ বা মহড়ার সময় বিশেষ বিশেষ স্থলে কৌতূহল বাড়াত তাঁর কৌতুকপর মূর্তি ও কণ্ঠস্বরের বিক্রীড়ণ।

লোক বুঝে কথায় নাজেহাল করার কোনো সুযোগই কবি ছাড়তেন না। মজা পেতেন মহিলাদের পেলে। স্নেহশীল কবি আধুনিকাদের কথার ভাঁজে ভাঁজে এমন এক-একটি কথা ছাড়তেন হাসতে হাসতে পেটে তাঁদের খিল ধরে যেত। কবি ভাব দেখাতেন, কথা তিনি আর কী জানেন; বসে বসে মিটিমিটি পরাহতদের নাকানিচুবানি খেতে দেখতেন স্মিতমুখে। ওদিকে হাসির তুফানে তখন ঘর কাঁপছে।

কাছের যাঁরা, তাঁরা কবির সুকুমার চিত্তের এই রসস্পর্শ বহুবারই পেয়েছেন। দূরের লোকেরাও বঞ্চিত হননি। কবির স্নেহভাজন এবং পারিবারিক হৃদ্যতার দিক দিয়েও ঘনিষ্ঠ, এমন এক বিজ্ঞানী চিকিৎসা-বিদ্যা-গবেষক ডাক্তার বাইরে থেকে প্রায়ই 'উদয়নে' আসা-যাওয়া করতেন।

আতিথ্যের সবদিক দিয়ে নিজে দেখাশুনা করা তো কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না, মাঝে মাঝে চায়ের টেবিলে তাঁকে নিয়ে বসতেন। ভদ্রলোক ছিলেন একটু মিষ্টান্ন-প্রিয়, খেতেও পারতেন। মিষ্টান্ন-সেবায় কবির সঙ্গে তাঁর রুচি মিলত, তবে পরিমাণটায় ছিল তফাৎ। কবি সব খোঁজই রাখতেন। একদিন তাঁকে বলে বসলেন—মিষ্টি তুমি কটা খেতে পার? ডাক্তার মানুষ, সতর্কতার সঙ্গে মাথা চুল্‌কে বললেন, লোকে আর ক'টাই বা খায়, দুচারটে যা হয়। প্লেটে তাঁর পড়তে লাগল বড়ো বড়ো পানতুয়া। শান্তিনিকেতনে পানতুয়াটার একটু খ্যাতি ছিল। ভদ্রলোক কত আর খাবেন। থামলেন। কবি খুব খুশি। মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন। জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, ঐ তো মাত্র খেলে,যাহোক এবারে বলো তো—মিষ্টিগুলো কিসের তৈরী? ডাক্তার মুখ তুলে চাইলেন। কবি এ আবার কী বলছেন! বললেন, মিষ্টি যা হয়ে থাকে—ছানার? আস্তে করে কবি বললেন, কেমন ঠকালাম,—বলতে তো পারলে না,—ওগুলো ওলের তৈরী। ওলের তৈরী অমন পানতুয়া খেয়ে ডাক্তার থ বনে গেলেন। কবির তখন হো-হো করে হাসি দেখা দিয়েছে।

ডাক্তার ভদ্রলোকটি একবার দিন কয়েকের ব্যবধানে এলেন শান্তিনিকেতনে। কবি তাঁকে দেখেই বললেন,—কী হে, এখানকার পথ ভুলেছ? ডাক্তার হেসে বললেন, এখানকার পথ যে একবার চিনেছে, সে কি আর ভুলতে

পারে? কবি এবার চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, না, না, পথ তো সেই পড়েই আছে,—কিন্তু ঘাসও তো গজিয়ে যেতে পারত? ডাক্তার তাঁর না-আসার প্রতি টিপ্পনিটুকুর সোজা অর্থটি বুঝলেন। এবারে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

ডাক্তার ব্যক্তিটি হচ্ছেন, কলকাতা বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। তিনি গেছেন দার্জিলিং-এ। কবিও তখন সেখানে আছেন। গুরুদেবের সঙ্গে ডাঃ সরকারের পরিচয় তখনও তত ঘনিষ্ঠ হয়নি। জীনস্‌-এর 'মিস্টিরিয়াস ইয়ুনিভর্স' বইখানি মাত্র বেরিয়েছে। বিজ্ঞানী তা পড়েই উৎসাহিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত কবিকেও বললেন বইখানির কথা। মনে করেছিলেন, কবিকে বিজ্ঞানের একটা নূতন খবর দিবেন। কিন্তু শোনা মাত্রই কবি বললেন, হ্যাঁ, বইখানি আমিও পড়েছি। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জেনো, ওরা যা বলছে, সব সত্যি নয়। বিশ্বে শক্তির (energy) যেমন ক্ষয় চলছে, তেমনি নূতন শক্তিও সৃষ্টি হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস হতেই পারে না, কিছুতেই একথা সত্য নয়। প্রায় পনর বছর পূর্বে কবি অটল বিশ্বাসে এই কথা বলেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় আজ পাশ্চাত্য থেকেই কবির বাণীর সায় শোনা যাচ্ছে।

দেখা যায়, তিনি তাঁর 'সাধনার রূপ' ব্যাখ্যা করে একখানি পত্রে নিজেই লিখছেন:

"একদিন আমি নিজের আত্মিক নির্জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দকে সংহতভাবে লাভ করবার

জন্যে সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলুম। যে কারণেই হোক সেই নিঃসঙ্গতা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। অতিশয় একান্তভাবে নিজের সত্তার নিগূঢ় মূলে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া আমার চলল না, যে বিচিত্র সংসারে আমি এসেছি আপনাকে ভুলে সহজভাবে সেখানে আপনাকে লাভ করতে হবে এই দিকেই আমাকে ভিতর থেকে পাঠালে।…আমি তাই নানা কিছুকেই নিয়ে আছি—নানাভাবেই নানা দিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসংগতি আছে, আমি তা অনুভব করি নে। আমি নাকি গাই, লিখি, আঁকি, ছেলে পড়াই—গাছপালা আকাশ আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই। কঠিন বাধা আসে লোকালয় থেকে—এত জটিলতা এত বিরোধ বিশ্বে আর কোথাও নেই। সেই বিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার এই চেষ্টার অবসান হবে না। আমার নিজের ভিতর থেকে আশ্রমে যদি কোনো আদর্শ কিছুমাত্র জেগে থাকে তবে সে আদর্শ বিশ্ব-সত্যের অবারিত বৈচিত্র্য নিয়ে। এই কারণেই কোনো একটা সংকীর্ণ ফল হাতে হাতে দেখিয়ে লোকের মন ভোলাতে পারব না—এই কারণেই লোকের আনুকূল্য এতই দুর্লভ হয়েছে এবং এই কারণেই আমার পথ এত বাধাসংকুল।”
বিচিত্র পথে ভিতরকার সত্তাকে প্রকাশ করবার তাগিদ যে কবির শুধু নিজের জন্যেই ছিল, কিংবা সেটুকুই যে তাঁর সাধনার সম্পূর্ণ রূপ, তা নয়; কারণ সে বিষয়টি পরিষ্কার

করে এর পরে ঐ পত্রেই বলেছেন: "একদিকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সুরুলের দরিদ্র চাষী পর্যন্ত সকলেরই জন্যে আমাদের সাধনক্ষেত্রে স্থান করে দিতে হয়েছে—সকলেই যদি আপনাকে প্রকাশ করতে পায় তবেই এই আশ্রমের প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে পারবে—তিব্বতী লামা এবং নাচের শিক্ষক, কাউকে বাদ দিতে পারলুম না।"

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮)

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই যে-কোনো মহা-বিদ্যালয়ের গর্বের বিষয়, সকলেই তাঁকে জানেন—কিন্তু ক্ষুদ্র চাষীদের কথা কে ভাবে, কেই বা জানতে আগ্রহী হয়। কবির প্রকাশের সাধনা তাদের প্রকাশকেও সমানভাবেই স্বীকার করেছে দেখতে পাই।

একবার গুরুদেব শ্রীনিকেতনে সভা ডেকেছেন। কুঠির দোতলায় জড়ো হয়েছেন বিশিষ্ট কর্মীরা। গুরুদেব নীরব। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি বসেই আছেন; সবই লক্ষ্য করছেন। অবশেষে সচিব তাঁকে সভার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তারা কোথায়? সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে—কারা? কবি বললেন, গ্রামের লোকদের চাই। আমি কি বাবুদের জন্য শ্রীনিকেতন করেছি? তৎক্ষণাৎ ছুটাছুটি লাগল। কারখানা, কৃষিবিভাগ ও শিক্ষাসত্র থেকে সকলের ডাক পড়ল। সবাই জড়ো হল। তখন তিনি গ্রামের শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে জুড়লেন নানা আলাপ নানা আলোচনা।

সমাজের উচ্চ স্তরে আসীন হয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র ভাব ও কর্মধারা মেলে দিয়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরে। তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার মধ্যেও এটা লক্ষিত হয়। তিনি যেখানেই বিরাজ করতেন, এমন কি আশ্রমের একধারে সেই 'উত্তরায়ণ' এলাকার ঐশ্বর্যবহুল জীবনের মধ্যেও কখনো স্থূলতাকে, বড়োলোকিকে প্রশ্রয় দেননি। রুচি ও সৃষ্টির প্রেরণায় অনেক ক্ষেত্রেই সে-জীবনের প্রভাব শিল্প ও সমৃদ্ধির প্রতি আগ্রহ জন্মাবার কারণ হয়েছে এবং শিক্ষারও অজস্র সুযোগ দিয়েছে, আরাম কি বিলাসের বিষয় হয়ে ওঠেনি। গোটা শান্তিনিকেতনটি একখানি বাড়ী। কবির জীবনও তেমনি। এর মধ্যে আছে অন্দরের হৃদ্যতা, বৈঠকখানার শোভনতা এবং মন্দিরের শুচিতা। পিতা ছিলেন 'মহর্ষি'। কবিকেও অনেকে 'ঋষি' বলে থাকেন। বিশেষ করে তাঁকে বলতে ইচ্ছে করে 'রাজর্ষি'। প্রথম জীবনে উপন্যাস লিখেছিলেন—'রাজর্ষি'। রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যের আলো আছে তাঁরও দেহে-মনে। ঐশ্বর্য ও উৎসবের সঙ্গে বৈরাগ্য, উৎসাহ এবং বীর্যবত্তায় ভরা তাঁর বিপুল বিচিত্র জীবন।

আরেক দিকে উড়িষ্যারাজ প্রতাপ-রুদ্রের মন্ত্রী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দের কথাই মনে পড়ে। নৃত্য, গীত, কাব্য ও বিদগ্ধজনে বেষ্টিত থাকতেন দুজনেই। কিন্তু নানা ক্ষেত্রের খোঁজ রাখতেন, নানা কাজে যোগও দিতেন এঁরা তেমনি আগ্রহেই। আবার একাধারে শ্রীচৈতন্যের মতো তত্ত্বাগ্রহীও ছিলেন আমাদের কবিগুরু। তবে সংসারের মধ্যেই তিনি

থাকতেন। কিন্তু 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তাঁরও আর ফুরাল না।

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা। —গীতাঞ্জলি

তত্ত্বচিন্তা-মণি নীলমাধবসেবী নীলাচলযাত্রী মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য জ্ঞানের ও রসের সাধনায় ছিলেন সমান সমাহিত। বিচিত্ররসের পূজারী আমাদের একালের কবিকেও জ্ঞান এবং রসের পিপাসা নিয়ে তার অনন্ত পরিক্রমায় একসময়ে বলতে শুনি ঃ

দিগন্তে বাদল বায়ুবেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে॥ (পরিশেষ, আমি)

তাঁর কালে তো বটেই, অনেক কালেই তাঁর মতো এমন 'সর্বত্রগামী' এমন সর্ববিষয়ী 'বিচিত্রের দূত' বিরল।

রবীন্দ্রনাথের আসর

'লিপিকা' গ্রন্থে পথকে বলেছেন কবি—'পদচিহ্নের পদাবলী'। পথের পাশে শান্তিনিকেতন। নানা ছন্দে সেখানে যে আসরের সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে ঘরের কথা ছাপিয়ে পথ-চলারই বাঁশি বাজে। পথের ধুলার ফাঁকে ফাঁকেই এখানে ফুল ফুটেছে, পাখি ডেকেছে, 'ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগা' আকাশে 'সূর্য তারারা দলে দলে ভিড় করেছে,' পথিক গেয়ে চলেছে :

চলি গো চলি গো, যাই গো চলে
পথের প্রদীপ জ্বলে গো—।

দোল পূর্ণিমা। আমবাগানের আবছায়ায় গানে গানে বইল 'ফাল্গুনী'র ফল্গুধারা। বৃদ্ধ কবির বয়সের আগল ঠেলে ফেলে আনন্দ-বেগ মুক্তি পেয়েছিল নৃত্যে অভিনয়ে। পল্লবের আড়ালে আড়ালে লাল নীল ফানুস জ্বলছিল ঝিকিমিকি। 'দাদা' সেজেছিলেন জগদানন্দ রায়, 'অন্ধ বাউল' হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ধীর পদসঞ্চরণের সঙ্গে উদ্বেলিত কণ্ঠে গান উঠেছিল :

তোমায় নূতন করে পাব ব'লে
হারাই ক্ষণে ক্ষণে
ও মোর, ভালোবাসার ধন।

—ভালোবাসার ধন চলে যায়। কিন্তু যে-গানের মধ্যে

তাকে ফিরে-ফিরে পাওয়া যায়, সেই গান রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এটি শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের দ্বিতীয়বারের ঘটনা। ১৩৩৪ সনের বসন্তোৎসবের রাত্রি বেলাকার অনুষ্ঠান।

কবির অনেক নাটকের অভিনয়ই এখানে হয়েছে। তিনি শেষদিকে অনেক খেটেছিলেন 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নিয়ে। কিন্তু মহড়াই হল, অভিনয় পর্যন্ত এগোল না। রোগশয্যার আগে 'শারোদৎসব' নাটকখানিই তিনি অভিনয়ে উৎরে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। যোগ্য বালক অভিনেতা না পেয়ে শ্রীভবনের একটি তেরো-চোদ্দো বছরের বালিকাকে শিখিয়ে নিয়েছিলেন উপনন্দের ভূমিকা। মাথার চুল তার খাটো করে ছাঁটা ছিল। আদর করে ডাকতেন—নেড়ীনন্দ; উপনন্দের অপভ্রংশ। অভিনয়কালে কবি একস্থলে নিজের ভূমিকা আগুপিছু গুলিয়ে ফেলেছিলেন। স্মারক (প্রম্পটর) সামলাবে কি, ব্যাপার দেখে চোখ কপালে তুলে সে তখন উদ্ধারের উপায় খুঁজছে,—ভাগ্যিস্ এরি মধ্যে পরবর্তী পাত্র এসে রঙ্গমঞ্চে ঢুকলেন, তিনি তার কথায় যথারীতি সূত্র ধরিয়ে দিতে, তবে ফাঁড়া কাটে। দর্শকরা কবিকে দেখে মুগ্ধ।—তাঁর কথার গোলমাল ধরবার মতো ফুরসৎ তাঁদের মেলেনি। নিজে নিয়েছিলেন 'রাজসন্ন্যাসী'র ভূমিকা। এবারকার অভিনয়ে কবি 'শারদোৎসবে'র মধ্যে হাস্যরসাত্মক অংশ হিসাবে 'গেছোবাবা' নামক তাঁর সদ্যরচিত রচনাটুকু জুড়ে দেন ও অভিনয় করান। আশ্রমের ডাক্তারবাবু শচীন

মুখোপাধ্যায়, উদ্ভিদ্-বিত্থার অধ্যাপক পূর্ণময় সেন প্রভৃতি পূর্ববঙ্গীয় অভিনেতারা স্ব স্ব আঞ্চলিক ভাষার আশ্রয় নিয়ে কৌতুক ও আনন্দ দিয়েছিলেন বাড়িয়ে।

শেষদিকে কলকাতার অভিনয়গুলিতে কবির ভাগ্যে মাঝে মাঝে দৈবদুর্বিপাকও ঘটেছে। ঠিক অভিনয় দিনেই অকস্মাৎ এক একটা বিক্ষোভজনক ঘটনা দেখা দিয়েছে। অস্বস্তিকর পরিবেশে কবিকে আরব্ধ উৎসব সারতে হয়েছে বা স্থগিত রাখতে হয়েছে। একবার ঘটে গান্ধিজীর গ্রেপ্তার। জওহরলালের গ্রেপ্তারের কথাও যেন মনে আসে। একবার চলেছিল হিজলিতে গুলি,—অন্যবার ঘটে আরেক হাঙ্গামা। অভিনয় দেখার আগ্রহে দর্শকদের এক অংশে ঘনায় দলাদলি, তারও জের যায় কিছুটা অভিনয়ের উপর দিয়ে।

আরেকটা অদ্ভুত বিঘ্নও একবার উপস্থিত হয়। সেবার 'নবীন'এর (৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭) পালা। আয়োজন হয়েছে নিউ এম্পায়ারে। দেশকে নূতন একটা জিনিস উপহার দেবেন—কবির মন আগ্রহে ভরা। রঙ্গমঞ্চের এককোণে যথারীতি তিনি প্রস্তুত হয়ে বসেছেন। প্রোগ্রামের দুটি অংশ। প্রথম অংশেই আছে জাপানী যুযুৎসু ও দেশীয় লাঠি-ছোরা-খেলার প্রদর্শনী। নামকরা জাপানী যুযুৎসু অধ্যাপক তাকাগাকিকে কবি শান্তিনিকেতনে এনেছেন। তাঁর শিক্ষাতে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের যুযুৎসুবিত্থায় পারদর্শী করে তুলেছেন। বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ পর্য্যন্ত সকল ভারই কষ্টেসৃষ্টে বহন করেছেন নিজে। কিন্তু বাইরের সাহায্য

না পেলে আর চলে না। দেশে তখন শারীরিক শক্তিচর্চা এবং আপৎ-প্রতিরোধের আয়োজন নিয়ে আন্দোলন চলছে। দেশবাসীর উৎসাহকে কেবল মুখের কথায় অভিনন্দিত না করে, শক্তিচর্চার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়কে কবি সকলের সুমুখে ধরলেন এবং এই বিদ্যায় হাতে-কলমে তৈরী হবার সুযোগ নেবার জন্যে আহ্বান জানালেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু দেখা গেল, চেয়ারগুলি পড়ে আছে, প্রেক্ষাগৃহ প্রায় জনশূন্য। উদ্বোধনে এই নিঃসাড় অবস্থা দেখে কবির আশা আহত হল। কিন্তু মূলে ছিল অন্য ব্যাপার। তখনকার অদ্বিতীয় ছায়াচিত্রাভিনেতা ডগ্‌লস্ ফেয়ার্ ব্যাঙ্কস্ বেরিয়েছিলেন বিশ্বভ্রমণে। সেদিন এবং ঠিক সেই সময়টিতেই তাঁর জাহাজ উপস্থিত কলকাতার জেটিতে। পঙ্গপালের মতো লোক ছুটেছে সেখানে। চোখে দেখা যাবে এমন একজন লোককে!—লোভ সংবরণ করা কঠিনই ছিল। যা হোক্ দ্বিতীয়দিনে কবির উৎসব অপেক্ষাকৃত জমে। কিন্তু তা থেকে তাকাগাকির খরচ উঠল না। শক্তি চর্চার দুরূহ আয়োজনকে অচিরেই পরিহার করতে হল। শুধু রয়ে গেল সেদিনের গানটাই—'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান'। নৃত্য-গীতের পাশাপাশি এই একটি বিশেষ বিদ্যার পথও একদিন শান্তিনিকেতনে এসে মিলেছিল, কিন্তু বেশিদিন টেকে নাই। তবে কবির প্রচেষ্টা যে কতদিকে গিয়েছে এটা তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

আত্মরক্ষায় বিশেষ ভাবে মেয়েদের স্বাবলম্বী করবার

জন্মেই ছিল কবির এই শক্তিচর্চার আয়োজন। খবরের কাগজে নিত্যনূতন মফঃস্বলের নানা কুৎসিৎ ঘটনার কথা চোখে পড়ত, আর কবি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। দূর থেকে প্রতিকারেব পথ অবরুদ্ধ। সেটা হত আরো মর্মদাহী। এই নিয়ে মৃত্যুর ছুবছর আগে পর্যন্ত নিদারুণ বেদনার সঙ্গে লিখেছিলেন 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি। মেয়েদের তিনি যে-মন্ত্রে তখন দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, সেই অমিততেজের অভয় মন্ত্রটি পাই অনেককাল আগে লেখা একটি গানে—

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।

* * *

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
ছুই নয়নে স্নেহেব হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ—

তখনকার কলেজের ছাত্র, এখন প্রবীণ, জনৈক বন্ধু বল্লেন যে, এই গানটিতে দেশ-মাতার যে-রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তার একখানি বৃহদাকার ছবিও ছাপা হয়েছিল। এই "শঙ্কাহরণ, আগুণবরণ'-রূপের কথায় কবি সকলের চেতনা উদ্দীপ্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। পরেরবার (১৩৩৮ ভাদ্র ২৮,২৯) গীতোৎসব-পালাতে এই গানটি সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। সেবারই 'শিশুতীর্থ' এবং 'ঝুলন' কবিতা অন্যদের নৃত্যাভিব্যক্তির সংযোগে কবি আবৃত্তি করেছিলেন। নারী-

শক্তির কল্যাণময়ী সৃষ্টিরূপ 'শিশুতীর্থে' সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়।

কবিকে বিচলিত করেছে কয়েকটি বিষয়। উৎসবের আসরেও তার প্রভাব এসে পড়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের জাতি-বিভাগ-জনিত অভিমান ও অপরের প্রতি ঘৃণা তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের মর্মমূলে আছে অস্পৃশ্যতার বেদনা। বহু আগে 'অচলায়তনে'র মধ্যে নাট্যরূপে এ-বেদনার আর একটি প্রকাশ ঘটেছিল। শেষ দিকে শান্তিনিকেতনের আসরে বিভিন্ন সময়ে দুটি নাটকেরই অভিনয় হয়েছে। দুটি নাটকই দুবার লেখা হয়। 'অচলায়তন' 'গুরু'র রূপ গ্রহণ করে, 'চণ্ডালিকা'ও পরিবর্তিত হয় 'নৃত্য-নাট্য চণ্ডালিকা'য়। গদ্যছন্দের কিনারা ঘেঁষে ভাষা ও ছন্দ পরীক্ষার একটি বিশেষ বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম লেখা এই 'চণ্ডালিকা' গ্রন্থ। পালাটিকে আবৃত্তি করেছিলেন গুরুদেব, আর মধ্যে মধ্যে গান গেয়েছিলেন মেয়েরা। আসরে এ-ভাবেই 'চণ্ডালিকা'র প্রথম প্রকাশ ঘটে। পরে আজ পর্যন্ত বারবার অভিনীত হয়ে চলেছে নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'।

নানা নাট্যে গল্পে কাব্যে গানে অবজ্ঞাত মানবের অন্তর্বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে কবির চিত্ত বারবার। 'নটীর পূজা' নাটিকায় 'শ্রীমতী'র মরণ-নৃত্যে বুদ্ধপাদপীঠতলে তারই বিশেষ অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'নটীর পূজা'র অভিনয়ে কবি 'ভিক্ষু উপালি'র ভূমিকা নিয়েছেন দুবার। তাঁর কণ্ঠে বৌদ্ধ মাঙ্গলিক মন্ত্রের আবৃত্তি ছিল অভিনয়টির বিশেষ আকর্ষণ।

কবির সঙ্গে অভিনয় করার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে লেখকও তাঁদের একজন। জয়ন্তী উৎসবে 'নটীর পূজা'র শেষ অভিনয় হয়। পক্ষকাল মধ্যে নিউ-থিয়েটর্স স্টুডিওতে ছায়াচিত্রে সে অভিনয় রূপান্তর লাভ করে। দুটি অভিনয়েই লেখকের ভূমিকা ছিল। 'নটীর পূজা'য় সেজেছিলাম অন্যতম বৌদ্ধ ভিক্ষু। দলের চারজন ভিক্ষুর মধ্যে আর তিনজন ছিলেন শ্রী-অনাদিকুমার দস্তিদার, শিল্পী শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর এবং গুজরাটী ছাত্র শ্রীপিনাকীন্ ত্রিবেদী। 'অরূপরতন' নাট্যের অভিনয়ে শেষবারে 'ঠাকুরদা'-বেশী গুরুদেবের সঙ্গে একই দৃশ্যে ছিলাম পথিক দলে। 'তাসের দেশে' ছিলাম স্মারক। 'নবীন,' 'গীতোৎসব,' 'শাপমোচন' ও এগারোই মাঘের উৎসব ইত্যাদিতে ছিলাম গায়কদলে। এসব উপলক্ষেই গুরুদেবকে এবং তাঁর উৎসবাদির পরিবেশ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল।

শরীরচর্চা এবং নৃত্যকলার অপূর্ব সমাবেশে গঠিত গুর্জর দেশের কাঠি-নৃত্যও কবির উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিরাট এক আসর বসেছিল বর্তমান কলাভবন ও সংগীতভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে। জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠ। মাটির মালসা ও নানা রঙের আলপনায় সাজানো ছিল অনুষ্ঠান স্থানটি। ছেলেমেয়েতে মিলে প্রায় শতাধিক লোক নাচে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের উত্তরীয়ে ঢেউ খেলছিল তরল জ্যোৎস্না-ধারা। বাদ্য ও গুজরাটি সংগীতে জাঁকিয়ে তুলেছিল আসর। তালে তালে চলছিল সুপরিকল্পিত চক্রাবর্তন। কাঠিগুলির

মৃদু ঠেকা চারদিক মুখরিত করেছিল। কবিকে সম্মুখে পেয়ে সকলের আনন্দ আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। ধুয়া ছিল গানের—'সখি, রমিয়ে রমিয়ে এল রাস রঙ্গম'। ইতিপূর্বে সিংহসদনের ছাদে মহড়া দিয়ে একবার গৌরপ্রাঙ্গণে গুজরাটী গরবা-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। ঐরূপ আর একবার এক আসর বসেছিল কলাভবনের প্রাঙ্গণেও। এর কোনো একটিতে নাচের সঙ্গে গানের ধুয়া ছিল—'রসিয়া, মুঝে যাবা দে'। কলকাতার আসরেও কবি ঘট এবং কাঠি নিয়ে গরবা-নৃত্যের অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন 'গীতোৎসবে'। শ্রীমতী দেবী, অধুনা শ্রীমতী ঠাকুর, অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমায় কবির আবৃত্তির সঙ্গে ভাবাভিব্যক্তি দান করেছিলেন। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও তিনি শান্তিনিকেতনের উৎসব-আসরে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যের ধারাটিকে রক্ষা করেছিলেন কবির দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী।

গানের আসর শান্তিনিকেতনে প্রতিদিন এবং প্রায় প্রতি প্রহরের ব্যাপার। মেয়েরাই এখন এর প্রধান অংশীদার। একবার এর বৈপরীত্য ঘটে। শুধু ছেলেরাই ছিল গানের দলে। শ্রোতা ছিলেন একজন—স্বয়ং সংগীতকার। উদয়নের উত্তর দিকের বারান্দায় এ অনুষ্ঠান হয়। সেখানে এক সন্ধ্যায় ছেলেরা মেলে। সংগীতভবনের জনৈক শিক্ষকের হাতে ছিল সকল বিভাগের ছাত্রদের গানের ক্লাস। শিক্ষকটি ছিলেন কবির অপিসের কর্মীও। কবি তাঁকে এ সুযোগটুকু দান করেছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে পাঠভবন,

শিক্ষাভবন, কলাভবন ও সংগীতভবন সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি ছাত্রদ্বারা গীত বারো-তেরটি গান কবি শুনেছিলেন। আশ্রমে এত ছাত্র যে গান শেখে, এই উপলক্ষে সাক্ষাৎভাবে তিনি তা জানতে পেরে বিশেষ প্রীত হন। গানের পরিবেশ সৃষ্টিতে এরকম ব্যাপক অনুশীলন যে একান্তই আবশ্যক, এ মন্তব্যও করেন তিনি। মণ্ডলীর মধ্যে সেদিন একটি দক্ষিণ ভারতীয় বালক ছিল। নাম মুথ্থু। গলাটি ছিল তার মোটা, মিষ্টি এবং খুব সূক্ষ্ম কাজে ভরা। দুঃখের বিষয়, বেশিদিন সে সুযোগ পেল না। বাইরে গিয়ে শেষে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সপ্তাহে এক-একদিন বিশেষ বিশেষ ভবন থেকে দল বেঁধে ছেলেমেয়েদের সকাল বেলা বৈতালিক গাইবার ব্যবস্থা যা চলছে, উক্ত শিক্ষকই তার প্রবর্তন করেন। এর আগে আশ্রমে লোক অল্প থাকায় বাঁধা কয়েকজনে মিলেই বৈতালিকের আসর চালাতেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাত্যহিক সংঘ-জীবনের সুর বেঁধে দিয়েছেন কবি দিনের সর্বপ্রথম কৃত্য এই বৈতালিক অনুষ্ঠানটি দিয়ে—সে কতকাল আগে থেকে।

গুরুদেবের সারাদিন নানা কাজে কাটত। সন্ধ্যায় যে-দিন একটু নিরিবিলি ঘটত, আপন মনে একান্তে প্রিয় গানগুলি গাইতেন। তার মধ্যে তাঁর যৌবনে লেখা প্রেম আর পূজার গানই ছিল বেশি। মাঝে মাঝে অন্য দুএকজনকেও তা শেখাতেন। একদিনকার কথা মনে পড়ে। উদয়নের

একতলায় সামনের চাতালে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসে গান শেখাচ্ছেন সংগীতভবনের ছাত্রী রাজেশ্বরী দেবীকে। গেয়েই চলেছেন। কণ্ঠে আকুলতা কুল মানছে না। পুরানো গান—'আমার পরাণ লয়ে কী খেলা খেলাবে'। কখনো গাইতেন—'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে'। তখন কোথায় থাকত কে,—বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে ফিরে ফিরে চলত একই কথার আবর্তন—'বড়ো বেদনার মতো', মনে হত, একজন ছাড়া আর কেউ তাঁর নেই। অমনি করে গাইতেন—'সংসার যবে মন কেড়ে লয়'। প্রাতে মন্দিরের গান ছিল তাঁর—'বিমল আনন্দে জাগো রে'। শান্ত গম্ভীর আলাপে সকলেরই মনের আবেশকে ঘনিয়ে আনতেন, নিজে ডুবে যেতেন ধ্যানের গহনে। কণ্ঠ কখনো দ্রুত নেমে যেত খাদে, আবার বিলম্বিত লয়ে টেনে টেনে সুরের বিস্তার দ্বারা আনন্দের ধনকে ঘিরে ঘিরে সে-ধ্বনি খেলা করত। সুপ্ত শ্রোতৃ-মনেরও ঘুম ভাঙাত ঐ খেলাতেই। হঠাৎ গলা সাফ্ করার ভারী শব্দের সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে শুরু করতেন ভাষণ। ঘরেও ঐ গানটি গাইতেন।

আধুনিক গানগুলি ছিল তাঁর শিল্প-সৃষ্টির রাজ্য। পুরানো গানগুলি ছিল তাঁর উপলব্ধির অতল। আধুনিক গানে সুর বসাতেন. গাইতেন বেশি পুরানো গানই।

সুর যোজনার কালে কলিগুলি আওড়াতেন। গানের তখন ভাঙাচোরা অস্থির অবস্থা। কৌতূহল জাগত। কিন্তু তখনো পাগল করে দেবার মুহূর্তটি থাকত দূরেই। পাগল

বলা যেত তাঁকেই। কণ্ঠের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই,—গানের সম্পূর্ণ রূপ না দিয়ে। তারপর আছে শেখাবার পালা। আছে স্বরলিপিকারদের সুর যোগানো। কিন্তু একবার যখন গাইয়েদের কণ্ঠে সুর আসন নিল, গুণ্ঠন খুলে দেখা দিল তার শোভা-সম্ভার ও আবেদন তখনই স্থির থাকা হত দায়। চারিদিকে ফুলের বাগান। কুঞ্জে-কুঞ্জে অলিগুঞ্জন-ধ্বনি। কোন্‌টা গানের রেশ,—গান থামার পর স্পষ্ট বোঝা শক্ত হত। আপিসের কাজ করব, না গান শুনব, না গানের কপি রাখব, না ভিতরের তাগিদ মেনে সুর সাধ্‌ব। বিহ্বলতায় কেটে যেত সময়। অমিয় বাবু (ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী) হেসে মাঝে মাঝে বলতেন—'আমাদের আপিস্‌টি কিন্তু বেশ'! অর্থাৎ আপিসও শেষে আসরে দাঁড়াল। অমিয় বাবুর গলায় গান শুনিনি বটে, কিন্তু গান ছিল তাঁর কথায় ও কলমে।

শুধু গান বা অভিনয় নয়, গুরুদেবের কাব্যরচনা উপলক্ষেও আসর জমেছে। বিশেষত 'শেষ সপ্তক' ও 'বীথিকা'র দিনগুলি মনে পড়ে। দিনে তিনচারটি করে তখন কবিতা লেখা হচ্ছে। আছেন উদয়নের একতলায়। স্নানের ঘরে ঢুকেছেন দুপুর গড়িয়ে। কাজ না সেরেই ছুটে এসেছেন লেখার টেবিলে। মনে এসেছে আকাঙ্ক্ষিত কলিটি। চিঠি লেখার প্যাড্‌ টেনে লিখে ফেললেন লাইনগুলি। স্বস্তির সঙ্গে ফিরলেন বাকি কাজে। কবিতাটি কপি করে সম্পূর্ণ রূপটা টেবিলে রেখে দিতাম। কোনোমতে স্নানাহার সেরেই

বসে যেতেন রচনার প্রসাধনে। নূতন লেখায় হাত দেবার প্রাক্কালটিতে কলম নিয়ে মুহূর্তকাল নিবিষ্ট হয়ে বসা,—কপালের রেখা-বহুল আকুঞ্চন,—নীরব নিরালা সেই মুহূর্তে চিরকালের ভাবী রস-মহোৎসবের সূচনা করত। সদ্যরচিত কবিতাগুলি দপ্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে, প্রতিরাত্রে চোরাই মালের মহোৎসব লাগত গোয়ালপাড়া বা সুরুলের গ্রামের পথে। তিন সঙ্গীর ছোট্ট একটি ঘনিষ্ঠ 'লক্ষ্মীছাড়ার দল' ছিল সেই নীতিবিগর্হিত কাজে রত। কেটে যেত রাত, কবিতার কথা ফুরাত না। গুরুদেবও তা জানতেন। খুঁটিয়ে সব খবর নিতেন।

আশ্রমবাসীদের দিয়ে কবিতা ও গল্পের আসর বসত প্রায় প্রতি মঙ্গল বারেই। তাতে পলাতকা, পুনশ্চ, হাস্যকৌতুক, বৈকুণ্ঠের খাতা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গুরুদেব নানা রচনা পড়ে শোনাতেন। গল্পগুচ্ছের 'ছুটি' গল্পটির সেই 'মারো ঠেলা হেইয়ো' আর শেষ কথাগুলি—'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি', কানে বাজে। কোনোরূপ উচ্ছ্বাসের সুর নেই। পড়ার শেষে বইখানি বন্ধ করে পাশে রেখে দিলেন। এই করে অনুভবের একটি অবকাশ দিতেন যেন সবাইকে। প্রত্যেক অভিনয়ের আগে অভিনেয় নাটকও এভাবে পড়া হত।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও সাহিত্যের আসরের পুরাকালের প্রিয়জন ছিলেন ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চোধুরী মশাই।

আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যেও এঁদের দুজনের প্রতি কবি বিশেষ-ভাবে স্নেহানুরক্ত ছিলেন। কয়েকবারই এঁদের শান্তি-নিকেতনে আসার কথা হয়। কত আগ্রহে কবি পথ চেয়েছিলেন, শেষে কাছে পেয়ে কত খুশি। কবিকে বুঝবার লোক ছিলেন এঁরা। তা ছাড়া, নিজেদের সৃষ্টিশীলতার দ্বারা কবির ঔৎসুক্যও এঁরা জাগিয়ে রাখতেন। আর একজন ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কবির জীবদ্দশাতে শিল্পাচার্য দুবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শেষবারের বিবরণী প্রবাসীতে রক্ষিত আছে। যে কদিন এখানে ছিলেন, আসর কামাই যায়নি। গল্পের আসর, ছবির আসর.—আসর লেগে থাকত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। এ ছাড়া সভা, বক্তৃতা তো ছিলই। আর একজন এসেছিলেন,—তিনি আসর জমাননি আশেপাশে। কথা বলতেন কম। কিন্তু তাঁর আসর জমানোর কাজ চলত বেশির ভাগ বিদেশে। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারে ইংরেজী অনুবাদের দ্বারা প্রভূত কাজ করেছেন যিনি, এই নিরীহ ব্যক্তিটি হচ্ছেন সেই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি একপত্রে লিখেছেন—সন্তানের চেয়ে কম দেখতেন না তিনি এঁকে। সান্নিধ্যে থেকে দৃষ্টিতে এবং কথায় সে স্নেহধারা লক্ষ্য করা যেত।

শেষদিকেও শান্তিনিকেতনের দল কোনো উৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকোতে গেলে, 'বিচিত্রা'য় মহড়ার সময় আসতেন গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রবীণগণ। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তখন যেন ঠাকুর-

বাড়িতে ইন্দ্রসভা বসতো। পরিবারের বধূ শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত অতীব হৃদয়গ্রাহী ছিল। সপ্ততিতম রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে শ্রুত তাঁর দুটি গান মনে আছে। একটি 'মরি লো মরি', অন্যটি 'শাপমোচনে'র অন্তর্গত 'সখি, আঁধারে একলা ঘরে মন মানে না'। আজো সে-গীত-মূর্ছনার তুলনা মেলেনি। কবির এখানকার পরিজন-দের মধ্যে শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর এবং শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুরই অভিনয়ে বেশি অংশ গ্রহণ করেছেন। 'তপতী' এবং 'অরূপরতন' নাটকে রাণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন অমিতা দেবী। 'তপতী'তে রাজা বিক্রম, এবং 'অরূপরতনে' অদৃশ্য রাজা সেজেছিলেন কবি। পারিবারিক সম্বন্ধে নাতবৌ ভূমিকার পাত্রী হওয়ায়, সেই নাটকের অভিনয়ের পর থেকে কবির কাছে অমিতা দেবী 'মহিষী' আখ্যা পেয়ে গিয়েছিলেন।

'অরূপরতনে'র অভিনয়। শান্তিনিকেতনের আসর। ঠাকুর্দার ভূমিকায় 'জীর্ণপাতা' গানটি গাইতে গাইতে মঞ্চে কবি আত্মহারা। পঁচাত্তর ছিয়াত্তরের কোঠায় বয়েস, গলার স্বর উদাত্ত, কপালে সুস্পষ্ট বলি-রেখা, শুভ্র কেশ শ্মশ্রু, শুভ্র বেশবাস—নিরঞ্জন মূর্তি—বারে বারে গেয়ে চলেছেন আবেগ ভরে :—

আমার জীর্ণপাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাকদিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে
ওগো আমার নিত্য নতুন দাঁড়াও হেসে
চলবো তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।

খাসমহল তাঁর কাব্য ও সংগীত। সেক্ষেত্রে চর্চা তো হরদমই চলত। অন্যের কাব্য পড়ে অনেককে শুনিয়েছেন, নিজের কাব্যও অন্যের মুখে শুনেছেন কম নয়। কিন্তু নিজের সংগীত নিয়ে একবার তাঁকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল আশ্রমে এবং উত্তরায়নেই। সেদিনটির কথা বিশেষ করে আরো মনে আছে অন্য কারণে। বিলাতেও এক সংকট ঘটেছিল সেই সময়ে। তবে সেটি ছিল রাজনৈতিক। সঙ্গে অবশ্য কাব্য ও সংগীতের আবেদন একটু ছিল ঘটনাটির মনস্তাত্ত্বিক দিকে। অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ ঘটে ঠিক সেই দিন সন্ধ্যাতেই। এদিকে তখন কবির আবাসে উত্তরায়ণের পিছনের বারান্দায় চলছে একটি গানের আসর। পশ্চিম ভারতের জনৈক ওস্তাদ পর পর দুদিন গেয়ে চলেছিলেন উচ্চাঙ্গের নানা সংগীত। ভজনই ছিল বেশি। উপভোগ্য হচ্ছিল সন্দেহ নাই। আসরের মধ্যদিকে রাজার রাজ্যত্যাগের সংবাদ সেখানে পৌঁছায়। আসরের শেষ দিকেই ঘনাল এখানেও এক সংকট। ওস্তাদজী শোনাতে চাইলেন নিজের আরোপিত সুরে 'গীতাঞ্জলি'র গান। কয়েকটি গান গাইলেন। 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতরো হে' তাদের মধ্যে ছিল একটি। তাঁর উদ্দেশ্য ও অনুরাগ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কবির অবস্থাটিও কল্পনীয়। সুরের উপর দিয়ে রোলার চালনার বিষয়ে সকলকে সাবধান করলেও কবিকে সেদিন ঠায় বসে থেকেই শুনতে হয়েছিল রোলার নয়, রাগিণী

চালনা। রোলারটা বিশেষ করে চলছিল কথার উপরে। 'বিকশিত করো'র স্থলে 'বিক্‌সিৎ করো'—এই ধরণের তাঁর দু-চারটে নমুনার কথা এখনো অনেকের পক্ষেই ভোলা বড়ো শক্ত।

নাচ, গান, অভিনয়, কবিতা, গল্প, সভা সমিতিতে অনেক লোকই কবির উৎসবের অংশীদার হয়েছেন। কেউ শিল্পীর ভূমিকা নিয়ে, কেউ দর্শকের আসনে থেকে। কিন্তু দুএকটি আসরে কবির সঙ্গী ছিল বিরল। শেষকালে 'রেখার মায়া'য় তাঁকে পেয়ে বসেছিল, সে কথা অনেকে জানেন। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে কম লোকেরই। তাঁর ছবির আসর জমেছিল সাগরপারে। কলম আর তুলি আপন মনেই পসরা সাজিয়েছে। শেষপক্ষের উপরই নাকি টানটা যায় বেশি। নূতন কলাবিদ্যার ক্ষেত্রে এই অনুরাগের আধিক্য সকলের উৎসাহ আকর্ষণ করতে পারেনি। পরিচয়ের স্বল্প অবকাশই তার অন্যতম কারণ। তা ছাড়া, ছবিকে বাঁধাধরা অভ্যস্ত ধারায় সাজিয়ে ধরে তিনি পরিচয়ের পথ ততটা সুগম করেন নি। এইদিক দিয়ে দেশের মধ্যে থেকেও তিনি বিদেশী ছিলেন। এইজন্যেই যেন এতে আরো দরদ ঢেলে দিয়েছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকার জয়ন্তী-সংখ্যায় শিল্পী যামিনী রায়ের রবীন্দ্র-চিত্রশিল্প সম্বন্ধে একটি লেখা পড়ে কবি পরম উৎফুল্ল হয়েছিলেন। আমাদের দেশে শিল্পী-সমাজ থেকে কম লোকেই অমন মন খুলে এর মূল্য দিয়েছে এত প্রকাশ্যভাবে। এটি কবির অন্তর স্পর্শ করেছিল।

আসর কি তাঁর একটি ? রবীন্দ্রনাথের আসর ছিল নানা রকমের, নানা কিছু নিয়ে। আরেকটি আসর ছিল কবির খাস গৃহপ্রাঙ্গণে। সকালে-বিকালে পায়চারি করে ফিরতেন। ছোটো ছোটো বেঁটে সব আম গাছ। ফল ধরেছে ডালে-ডালে। হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে একটি ছিঁড়েই নিলেন। হাতের জোরেই দুখণ্ড করলেন। শিশুর মতো একটু চাখ্‌লেনও, একটু গন্ধ শুঁখ্‌লেন,—দিলেন ফেলে। বাগানের আম! অথচ আম কিন্তু তখনো সবে কচি। যখন পাকবে, তখন চলে যাবেন তিনি ছুটিতে বাইরে। শেষে বাইরেও তাঁকে পাকা আম পাঠানো হত। পায়চারির মুখে ডাল নুইয়ে শুঁখ্‌তেন ফুলের গোছা। তা ছাড়া ফুলদানিতে ফুল থাকতই। কুকুর ‘লালু’ ফিরত সঙ্গে। রুটির টুকরো না এগিয়ে দিলে, এগিয়ে খেতে সে ব্যস্ত হত না। বয়েস হয়েছিল। টেবিলের অদূরে পা ছড়িয়ে রাজকীয় ঔদার্যে সে অবস্থান করত। ময়ূর ছিল কয়েকটি। সারস ছিল। ছিল রাজহাঁসও। এদের সঙ্গে বনে গিয়েছিল উদয়নের দক্ষিণের বাগান। এসব মিলে গড়ে উঠেছিল কবির অন্তরঙ্গ একটি স্বতন্ত্র জগৎ। জড়ে জীবে সেখানে তফাৎ ছিল না। কবির সঙ্গে তাদের কী ধরনের আদান-প্রদান চলেছিল, গদ্যকাব্য-গুলিতে তার পদাবলী গাঁথা আছে।

তার চেয়ে আরো নিরালার আর-একটি নিগূঢ় আসরের সন্ধানও পাওয়া যায়। বিশেষত ছুটির মধ্যে বা পরিবারের লোকজন দূরে থাকলে, কোনো কোনো সময় কবিকে

যখন একা কাটাতে হত, তখন ঐ প্রকাণ্ড প্রাসাদে বা অত বড়ো প্রাঙ্গণের এক টেরেতে 'শ্যামলী'র কোঠায় কবির নিঃসঙ্গতার ছবি বড়ো বেশি চোখে লাগত। পরিচারকেরা থাকত কাছাকাছি। কিন্তু দোরজানালা কবি দিনরাত রাখতেন খোলা। নিঃসীম কান্তার। মরুডাঙার একধারে বাসা। কিন্তু ভয়-ভাবনা তাঁর ছিল না। যদিও চিঠিপত্রে মজা করে অনেককে অনেক কথাই লিখতেন। মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস রাখতেন। শান্তিনিকেতনে সে বিশ্বাস তাঁর বাধা পায়নি। আশেপাশে উপদ্রব দেখা দিয়েছে কদাচিৎ। শোবার ঘরের দোরে রাত্রিবেলা একটি লণ্ঠন জ্বালানো থাকত ক্ষীণ-শিখায়।

এর পরে মনের চোখে ধরা দেয় বাকি ইতিহাস। সে ইতিহাসের খবর জোগায় কবির গান। কান পেতে শুনি—

আজি যত তারা তব আকাশে

—কবি শুন্‌ছেন আর তন্ময় হয়ে গানে গানে বল্‌ছেন :

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।

—সে আসরের রূপটি কী জৌলসে ভরা বর্ণনায় বলছেন :

আজি নিদ্রা বিহীন গগনতলে
তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে।

অথবা—যেদিন অন্ধকার ঘন ঘোর, সেদিনও নীরব ধরায় কবিকে গাইতে শুনি :

আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে কে জাগে
ঘন সৌরভ-মন্থর পবনে জাগে, কে জাগে ॥

এই অপার অম্বর পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে—জাগে, কে জাগে ॥
মম গভীর অন্তর-বেদনে জাগে, কে জাগে ॥

সজনে বিজনে কোনোখানে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না। রাতের আসরে কোন গুণীর সঙ্গে তাঁর অফুরন্ত সংগত চল্‌তো তা কি কেউ বলতে পারে। প্রভাতে দেখতাম যেন কোন এক অব্যক্ত মূর্ছনায় মুক্তি পেয়ে রাতের সংগীত তাঁর মুখচ্ছবিতে নবজ্যোতি দান করেছে।

কবির আশ্রমে সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠান এবং তার সঙ্গে নৃত্য-গীত অভিনয় আবৃত্তি অহরহই হয়ে থাকে। আশ্রমের ছোটো ছোটো গৃহস্থ-জীবনের ঘেরায়ও তার প্রভাবের প্রসার স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় যখন গুরুপল্লীতে থাকতেন, সেখানকার ছেলেমেয়েদের সহযোগে তাঁর পরিবারে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান নিয়ে অভিনয় হত। কবির রচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইত্যাদি গীতি-নাট্য ও নাট্যকাব্যগুলির রূপায়ন অনুষ্ঠানগুলিও সে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাড়ীর গৃহিণীরই যত্ন ছিল এসকলের মূল উৎস। মাঘোৎসবের উপলক্ষে গুরু-পল্লীর সে-বাসায় গুরুদেবও একবার হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত

হন এবং পারিবারিক উপাসনায় সকলের সঙ্গে যোগদান করেন (১৯২৬)।

মন্দিরের উপাসনা-কাজে গুরুদেব শেষকালে আর আসতে পারতেন না। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী আশ্রম ছেড়ে গেলে পর, ক্ষিতিমোহন বাবুই নিয়মিত সেকাজ চালাতেন। 'শান্তিনিকেতন'-মন্দিরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের উপদেশাবলীর সংগ্রহ-পুস্তক থেকে তিনি এক-একদিন এক-একটি অধ্যায় পড়ে যেতেন। আর গান হত। এক বুধবার টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে। বহুদিনের ব্যবধানের পর অকস্মাৎ শোনা গেল গুরুদেব আসবেন মন্দিরে। চারদিকে ব্যস্ততা দেখা দিল। অভাবিত উৎসব। সকলে সমবেত হয়ে মন্দিরে তাঁর উপদেশ শুনলেন। একেবারে শেষদিকে মন্দিরের গানগুলি ঠিক করে দিতেন মাঝে মাঝে গুরুদেবই।

মন্দিরের সম্মুখে দক্ষিণ তোরণের এক পাশে একটি সুদীর্ঘ মহানিম গাছ খাড়া ছিল। কচি কচি সবুজ পাতায় ঢাকা ছিল তার শাখাগুলি। মাথা উঠেছিল সুদূর আকাশে। গুরুদেবের ভাষণ যেত আমাদের কানে। আর আমাদের চোখ মাঝে-মাঝে পড়ত গিয়ে ঐ গাছের দিকে। মন চলে যেত গাছের মাথা বেয়ে সোনামাখা সেই পথে, যে পথ দিয়ে আলোভরা সুন্দর সকাল—নূতন প্রাণ নিয়ে নেমে আসছে পৃথিবীতে। মন্দিরে প্রায়ই গুরুদেব গাইতেন :

> নূতন প্রাণ দাও, প্রাণ সখা, আজি সুপ্রভাতে।
> বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে
> প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে।

বহুদিনের কথা, সবার আগে একটি লোক চলে আসতেন মন্দিরে। ঐ তোরণে দাঁড়িয়ে নিজে বাজাতেন ঘণ্টা। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বেজেই চলত। বহুক্ষণ ধরে আশ্রমের গুরুদেব নিজে ঐ ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা উপাসনায় আহ্বান করতেন তাঁর আশ্রমবাসীদের। আশ্রমের প্রাক্তন প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের কাছে শোনা এ-কথাটি। মন্দিরের অনুষ্ঠান আগে বুধবারে সন্ধ্যার দিকেই হত, এ কথাও তিনি বলেছিলেন।

কেবল মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উপাসনায় নয়, কবির আহ্বান ব্যাপ্ত হয়েছে জীবনের প্রতিদিনকার নানা অনুষ্ঠানে। শান্তিনিকেতনে যত কিছু উৎসব, যত কিছু ঘটনা, যাই হোক না কেন, সব কিছুর গভীর তাৎপর্যের মূল কথাটি মন্দিরে হয়েছে ব্যক্ত। কিন্তু খেলাধুলা, গান, অভিনয়াদিও তাঁর কাছে কেবল চিত্তবিনোদনের বিষয় ছিল না, তাও ধর্মেরই পাশে শ্রদ্ধা পেয়েছে। সবই ছিল তাঁর উপাসনার উপচার। এজন্য সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযম ও শুচিতা মিলে তাঁর বিনোদনের ক্ষেত্রগুলিকে নিয়তই একটি অপূর্ব মহিমা দান করেছে।

প্রথম তখন শান্তিনিকেতনে এসেছি। কবির 'ঋতুরঙ্গে'র পালা চলছে। দুপুরে শিশু-বিভাগে রোজই জমে ছেলে-মেয়েরা, নূতন নূতন গান তৈরী হচ্ছে। সংগীতাচার্য দিনুবাবু দল নিয়ে বসেন মহড়ায়। আশে পাশে বয়ে যায় 'সুরের সুরধুনী'। 'নৃত্যের তালে তালে', 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' প্রভৃতি গানের সুরোন্মাদনায় দিক ভরপুর। বাজ্‌ত বৈকালিক

ক্লাশের ঘণ্টা। আসর ভাঙত। ছেলেরা দল ভেঙে বেরিয়ে আসত। মুখে মুখে ফিরত গানের কলিগুলি। ভাবতাম একবার যদি ঘরছাড়া হয়ে ওদের মধ্যে ভিড়ে যাওয়া যেত! কবি প্রায়ই চলে আসতেন আশ্রমের ভিতরে 'দেহলি' ভবনে। সেখানে দিনুবাবুকে দিয়ে যেতেন সুর। গানের ক্লাশ বসত তখন 'দেহলি'র পাশের ঘেরানো ঘরগুলিতে। সেই ছিল সেকালের 'নূতন বাড়ী'।

নিজের পরিবারে বা শান্তিনিকেতনের সীমাতেই কবি তাঁর আসরকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। যে মহাগুণীর তিনি চেলা,—মহাদেশে মহাকালে তাঁর আসর ' সেই আসরেরই তিনি একজন সংগতকার ছিলেন; সেখানকার নেশায় মেতেই তিনি গেয়েছেন:

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে,
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে॥
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়,
আলোছায়ার জোয়ার ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে
রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদাকালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান্ রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে।

তাঁর জীবনের অর্থ আর কী হতে পারে,—একটি সংগত ছাড়া ! বিশ্বগুণীর বিশ্ব আসরের সেই দীক্ষাকেই তিনি ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে কলকাতায় 'বিচিত্রা'-র আসর জমিয়েছিলেন কলকাতা-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে। তারপরে শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে রাজধানীতে গিয়ে কত আনন্দের হাটই না বসিয়েছেন সর্বসাধারণের জন্যে !

শান্তিনিকেতনে কবির কাছে অনেক জ্ঞানী-গুণীও এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে। নিজ নিজ সাধনার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন অনেক সময় সেই সঙ্গেই। তার মধ্যে অনেক লোকের কথা, অনেক অনুষ্ঠানের ঘটা বাইরের লোকের ভালোই জানা আছে। বিচিত্র বিষয় ও ব্যক্তি-সমাবেশে কবির পরিবেশের জমকালো ছবিটির কিছুটা অন্ততঃ যাতে ধারণা-যোগ্য হয়, এ জন্যে স্মৃতি থেকে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ মাত্র করা গেল।

কবির সাক্ষাতে ক্বচিৎ-ঘটিত অখ্যাত অনুষ্ঠানের মধ্যে মনে পড়ে—রাশিয়ার এক মহিলা নৃত্যশিল্পী এসে নাচ দেখিয়েছিলেন কোনার্কে এবং বিখ্যাত গায়িকা ক্লারাবাট কবিকে গান শুনিয়ে-ছিলেন, প্রথম দিন দেহলীর একতলায়, দ্বিতীয় দিন সিংহসদনে। কবিও তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন, 'অন্ধজনে দেহ আলো' গানটি। বিলাত থেকে ফিরে শ্রীদিলীপ রায় কবির কাছে এসেছিলেন। প্রসিদ্ধ গীতিকার ও গায়ক ব্যারিষ্টার অতুল সেন কবির একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ছিলেন, তিনিও শান্তিনিকেতনে কবির অতিথি হয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। সুরসাগর হিমাংশু

দত্ত কবির 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়' গানখানির স্বরলিপি করে নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে এসে। দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে সেটা শিখিয়েছিলেন এবং কবি স্বরলিপি প্রকাশের অনুমতিও দিয়েছিলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীহরিপদ রায় এসেছিলেন নিউ থিয়েটার্স-এর পক্ষ থেকে, কতকগুলি গানের সুর লিখে নিতে। একবার পূর্ণিয়ার একজন মার্গসংগীত-শিল্পীকে সঙ্গে করে আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রঙীন হালদার প্রভৃতি ৩।৪ জনের একটি বন্ধুমণ্ডলী কবিকে নিয়ে উত্তরায়ণের বৈঠকখানায় মজলিস করেছিলেন। বহু গান হয়েছিল। তার প্রায় দশ বার বছর পরে অমনিতরো আরেকটি গুণীমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটেছিল। শ্রীঅমিয় সান্ন্যাল, শ্রীহারিতকৃষ্ণ দেব প্রমুখ পাঁচ-ছজনের একটি মণ্ডলী এসে দু-তিনদিন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। সান্ন্যাল মশায় তাঁর মধুর কণ্ঠে কবিকে উদয়নের একতলাতে গানের পর গান শুনিয়েছিলেন বিভিন্ন রাগরাগিণীর অশাস্ত্রীয় সুন্দর মিশ্রণ-বৈচিত্র্য দেখিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন তার তাৎপর্য। সুরসিক যতীন্দ্রনাথ বসু কবির বহুদিনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি একবার কবি-সাক্ষাতে এসে কয়েকদিন উত্তরায়ণের অতিথি হয়েছিলেন। কবিকে পালা-কীর্তন করে একদিন শুনিয়েছিলেন উত্তরায়ণেরই পিছনের বারান্দায়। তাঁর জামাতা বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসুও একবার কয়েকদিনের জন্যে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যান —কবির দুখানি প্রতিকৃতি সে সময় তিনি এঁকে নিয়েছিলেন। বৈদেশিক শিল্পীদের মধ্যে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাঙ্গেরিয়ান

শিল্পী মিসেস সাস্ ব্রুনার ও তাঁর মেয়ে। বহুদিন ধরে বহুক্ষণ ঠায় বসে থেকে থেকে কবি এঁদের আঁকার সুযোগ দিয়েছিলেন। শ্রীমতী রাণী চন্দও এ সময়ে একখানি ছবি এঁকে নিয়েছিলেন। মাদ্রাজের আচার্য নম্বুদ্রি দেখিয়েছিলেন উত্তরায়ণের একতলার পেছনের বারান্দায় কথাকলির মুদ্রাবৈচিত্র্য, পুতনাবধ, ননীচুরি, জলকেলি ইত্যাদি নৃত্যনাট্যাংশ যোগে। একবার উদয়শঙ্কর সদলে এসে নৃত্য প্রদর্শন করে কবিকে প্রণাম করে যান। সিংহসদনে সে অনুষ্ঠান হয়েছিল। আশ্রমে রাগিণীদেবী ও গোপীনাথের নৃত্য এবং সেরাইকেল্লার ছউনৃত্যের অনুষ্ঠানও কবিকে বিশেষ আনন্দ দান করেছিল। কেরল কলামণ্ডপ থেকে আচার্যসহ একদল নাচিয়ে এসে ভারতনাট্যম্ দেখিয়েছিলেন উত্তরায়ণের টেনিস খেলার মাঠে। বর্ষাকালে শ্যামলীতে বীণা শুনিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক গুণী। প্রসিদ্ধ গুণী আলাউদ্দীন খাঁ একবার তাঁর পুত্র আলী আকবর খাঁকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কয়েকদিনই তাঁদের যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা আশ্রমবাসীদের পরিতৃপ্ত করেন।

উত্তরায়ণে এসে কবির-আঁকা ছবির দিকে উৎসাহ দেখিয়েছেন শিল্পী শ্রীমুকুল দে এবং ডাঃ স্টেলা ক্রামরিশ। ছাঁচ গড়ে নিয়েছেন স্থপতি শ্রীসুধীর খাস্তগীর ও আশ্রমের শ্রীরামকিঙ্কর বৈজ। চৈনিক চিত্রশিল্পী জ্যুঁপিয়ো কবির শেষ অবস্থায় এসে ছবির দিকে কবির খুব উৎসাহ জাগিয়েছিলেন। কবির জন্মদিনে কবিকে তিনি কয়েকখানি ছবি উপহার দেন, তার মধ্যে খুব বেগবান একটি ঘোড়ার ছবি ছিল।

পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি. আর. দাশ মশায় একজন বিশিষ্ট শিল্পানুরাগী। তিনি কলাভবনের হ্যাভেল হল উদ্বোধন করেন। কবি তাঁকে পেয়ে সেবার বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায় শান্তি-নিকেতনে এসেছিলেন একটি রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলীর সঙ্গে মিলে। তা ছাড়া 'রবিবাসর'-এর আবির্ভাবের সঙ্গে কবি-সান্নিধ্যে বহু সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটেছিল, তা সকলেরই জানা আছে।

বৃদ্ধ বয়সে কবি বৃহত্তর-ভারত পরিক্রমায় বের হন। বলি ও যবদ্বীপে তাঁকে নিয়ে নানা আসর বসে। সেখানেও তদ্দেশীয় নাচ গান অভিনয় ইত্যাদির আয়োজনের কিরূপ সমারোহ হয়েছিল, কবি নিজেও তাতে ভাষণ এবং কবিতা আবৃত্তি দ্বারা কিরূপ আনন্দ বিধান করেছিলেন, 'যাত্রী' গ্রন্থে এবং অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থ থেকে তা জানা যায়। অনুরূপ আনন্দেরই উৎস খুলে গিয়েছিল তাঁর জাপান এবং পারস্য ভ্রমণের কালে। জার্মাণী হল্যাণ্ড বেলজিয়ম—পাশ্চাত্যের নানাদেশেই তাঁকে নিয়ে কম উল্লাসের সৃষ্টি হয় নি। কেবল তাঁকে কাছে পেয়ে নয়, তাঁর বই পড়েও নয়, তাঁর নাটক অভিনয় এবং চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষ করেও তাঁরা আনন্দমেলায় মেতেছিলেন। য়ুরোপে আমেরিকায় জাপানে শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে যাবার জন্যে কবির আমন্ত্রণ এসেছিল। সিংহলেই মাত্র তিনি সে-ভাবে যেতে পেরেছিলেন। সিংহলে 'শ্রীপল্লী' নামে

একটি প্রতিষ্ঠানও শান্তিনিকেতনের আদর্শে গড়ে উঠেছিল। ইংলণ্ডে এরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কবির কর্মধারা কিছু রূপ লাভ করেছে 'ডার্টিংটন হল'-এ। কবিরই এক পরম অনুরাগী এবং এককালের সহচর মিঃ এলমহার্ষ্ট সে অনুষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন। আজও সেখানকার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কার্যত যোগ রয়েছে। হল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক বাকে সস্ত্রীক একাধিকবার এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। কবির জীবদ্দশাতেই শেষদিকে তাঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনে আশ্রমে কয়েক বছর বাস করেন। দিনুবাবুর কাছে বাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখেন ও সেগুলির ইংরেজি স্বরলিপি তৈরী করে য়ুরোপে গ্রন্থ-প্রকাশের দ্বারা সংগীত-গবেষণায় আচার্য উপাধিলাভ করেন। ফ্রান্সের মঁসিয়ে ডানিয়েলু 'জনগণমন' জাতীয় সংগীতের একটি ইংরেজি-স্বরলিপি তৈরী করেন। তাঁর আরেক জন বন্ধু ছিলেন। দুজনে মিলে তাঁরা শান্তিনিকেতনে কবির কাছে খুব আসা-যাওয়া করতেন। কবির একখানি প্রতিকৃতিও ডানিয়েলু অঙ্কিত করেন। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের প্রধান কক্ষের দেয়ালে তা সংরক্ষিত আছে। ডাঃ টিম্বার্স-ও সস্ত্রীক এসেছিলেন শ্রীনিকেতনের সেবায়। রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে পাশ্চাত্য লোক-নৃত্যগীতাদির প্রদর্শনী দ্বারা তাঁরা স্বামীস্ত্রীতে মিলে উত্তরায়ণে একটি সন্ধ্যায় আশ্রমবাসীদের চিত্তবিনোদন করেছিলেন। অমনি করে ডাঃ গারমানুস্‌ও শুনিয়েছিলেন একদিন সন্ধ্যায় চমৎকার

বেহালা। তিনি ছিলেন বিদ্যাভবনের গবেষক, পণ্ডিত লোক। শান্তিনিকেতনের জাপানী নাচিয়ে ছাত্র 'মাকি' কবির বহু আসরে আনন্দ সৃষ্টি করেছেন। এ দেশীয় নাচের মধ্যে পৌরুষ ব্যঞ্জক ভঙ্গির দিকটাতে ছিল তাঁর কৃতিত্ব। বলি ও জাভা থেকেও অমনি দুজন ছাত্র এসেছিলেন। সংগীত ও কলাভবনের শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরা দেশে ফিরে যান। তাঁরাও নাচের দ্বারা উৎসবকে বৈচিত্র্য দান করেছেন। সিংহল থেকে বহু ছাত্রছাত্রীই শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষিত হয়ে ফিরেছেন। এঁদের অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল কবির সংগীত, ভারতীয় নৃত্য ও কলাভবনের শিল্পের প্রতি। এঁদের দ্বারা সিংহলে বিশেষভাবেই রবীন্দ্র-সংগীত ও শিল্পকলার প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে।

যাঁরা রবীন্দ্র-সংগীত চর্চায় শান্তিনিকেতনে এসে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পশ্চিমভারতের মারাঠি পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁদের অন্যতম। তিনি বিদ্যাভবনেও মহাভারতের পাঠ নির্ণয়ের গবেষক ছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন মার্গসংগীতের পণ্ডিত এবং বীণাবাদকরূপে। শেষে রবীন্দ্র-সংগীতেও বিশেষ অধিকার লাভ করেন। দেবনাগরী অক্ষরে 'গীতাঞ্জলি'র স্বরলিপি গ্রন্থ রচনা করে তিনি সর্বভারতে রবীন্দ্র-সংগীতের আসর বিস্তারের সহায়ক হন। এই রকম আরেকজন পণ্ডিত শান্তিনিকেতন আসরে গুণীর আসন গ্রহণ করেছিলেন বীন্‌কাররূপে—দক্ষিণ ভারতের সংগমেশ্বর শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবেই এজন্যে স্মরণীয়

থাকবে। আরো দুজন গুণীর নাম উল্লেখযোগ্য,—মারাঠি বামন শিরোধকার রবীন্দ্র-সংগীতের অন্যতম প্রধান ছাত্র ছিলেন, আর চিত্র শিল্পী বিনায়ক মসোজি ছিলেন একাধারে রবীন্দ্র-আসরের বাদ্য-যন্ত্রী এবং মঞ্চ ও রূপসজ্জাকর। রেকর্ডে রবীন্দ্র-সংগীতের সুধা যাঁরা বিলিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের শ্রীমতী সাবিত্রীগোবিন্দ ও সিন্ধী শ্রীমতী রাজেশ্বরী বাসুদেবের কণ্ঠমাধুর্যের দান কখনো ভুলবার নয়। বাঙালী অসংখ্য শিল্পী এবং শান্তিনিকেতনের বহু শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী ক্রমেই দিনের পর দিন রবীন্দ্র-আসরের বিস্তার করে চলেছেন নৃত্যে গীতে অভিনয়ে আবৃত্তিতে।

রবীন্দ্রনাথের আসরের প্রধান গুণী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, রমা কর, অনাদি দস্তিদার প্রভৃতির কথা বেশি বলা বাহুল্য। তাঁদের বিষয় এখন সকলেরই জানা।

বিশ্বভারতীর জন্য কবি জীবনাবসানের প্রাক্কালে শুরু করলেন ভারতের নানা দেশে ঘুরে অর্থসংগ্রহ। সে সঙ্গে তাঁর আসরের সুরও ছড়িয়ে যেতে লাগল শহর থেকে শহরে। শান্তিনিকেতনের শিল্পীদল 'তাসের দেশ', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা'—এ সব অভিনয় ও নৃত্য-নাট্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা নানাস্থানে দেশবাসীকে কবির শিল্পরুচি ও রসানুভূতির আবেশ ধরিয়ে দিলেন। বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, এলাহাবাদ, অমেদাবাদ, মাদ্রাজ, পাটনা, এবং

বাংলার মধ্যে ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গৌহাটি প্রভৃতি মফঃস্বল সহরেও সকলে শান্তিনিকেতনের আনন্দলোকের পরিচয় পাবার সুযোগ লাভ করেন। শান্তিনিকেতনের দল ছাড়াও বোম্বাইয়ে কিছুদিন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন গুজরাটি ছাত্র শ্রীপিনাকীন ত্রিবেদী, শ্রীবাচ্চুভাই শুক্লা প্রভৃতি মিলে রবীন্দ্র-আসরের ধারা জাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা গুজরাটিতে 'তাসের দেশ' নাটকের অনুবাদ করেন, স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে অভিনয়ে দেন তার রূপ। মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন।

আজ দেশে শহরে পল্লীতে রবীন্দ্রনাথের গান ও তাঁর কবিতার আবৃত্তি এবং সে সঙ্গে তাঁর প্রবর্তিত নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতির অনুশীলন বেড়ে চলেছে। তাঁর আসর এখন ঘরে-ঘরে। বিশেষ করে এই আসরের বাহন হয়েছে তাঁর জন্মতিথি। প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ দিনটিকে কেন্দ্র করে গোটা বৈশাখ মাসই চলে মহোৎসবের প্লাবন। বাঙালীর কাছে এখন এটি একটি জাতীয় উৎসব।

মহাপুরুষের জন্মদিন তাঁদের বিশেষ বিশেষ দানের কথা আমাদের স্মরণে আনে। সেদিন সেই অনুভবের মধ্যে আমরা তাঁদের আশীর্বাদ পাই। জন্মদিন 'পঁচিশে বৈশাখ' সাড়া তোলে বিশ্বমানবতার। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, মানুষে পশু পক্ষী পিপীলিকায় সর্ব জড়ে জীবে এক প্রেমসূত্রে গাঁথা অনন্তকালের এই 'আমি' বোধটুকু—বছরের বাঁধা তিনশ পয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিনের জন্যেও এখন

'রবীন্দ্রনাথ' নামটিকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে উদয় হয়। দিকে দিকে শঙ্খ বেজে উঠে, এক মহামানবেরই আগমনী ঘোষণা করে—যিনি বিশ্বমানবতাকে মূর্ত করে তুলবেন জীবনে জীবনে, যিনি নূতন নূতন বৈচিত্র্য দিয়ে জীবনের গতিকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলবেন কালে কালে, সুরে বেঁধে দেবেন নিখিল আসরের সপ্তস্বরা বীণা। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের দুটি গানের মধ্যে রয়েছে এই আশ্বাস বাণী। 'হে নূতন, দেখা দিক আরবার' গানটি 'পূরবী'—কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতারই একটি অংশ। পরে সুর যোজিত হয়ে এটি গানে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু 'ঐ মহামানব আসে' গানটি কবি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের দিনে বিশ্ববাসীকে উপহার দেন। শান্তিনিকেতনে কবছর আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব দুটি তিথিতে দুবার সম্পন্ন হয়েছে। একবার আশ্রম খোলা থাকার কালে নববর্ষের দিনে। সকলে তখন উপস্থিত থাকতেন। আরেকবার যথারীতি ২৫শে বৈশাখে—বন্ধ আশ্রমের নিরিবিলিতে। এই কারণেই দুবার দুটি উপলক্ষ ধরে দুটি গানের সৃষ্টি হয়। এখন এই দুটি গানই রবীন্দ্র জন্মতিথির আনুষ্ঠানিক সংগীত রূপে প্রচলিত।

'নব জীবনের আশ্বাসে' উদয়শিখরের 'মাভৈঃ মাভৈঃ' নিয়ে কবির এই শেষ গান উদ্গীত হয়েছে। শেষ গানের 'মাভৈঃ মাভৈঃ' শব্দটি একটি বিশেষ ভাব আমাদের মনে জাগিয়ে দেয়। সে ভাবটি হচ্ছে 'অভয়'। 'হে নূতন' গানটীর

মধ্যেও সব জড়িয়ে প্রচ্ছন্ন আছে অসীমের চিরবিস্ময়ে ভরা নূতন জীবনের অবাধ জয়যাত্রার অভয়। রূপে নূতনত্ব, কিন্তু রসে দুটির মধ্যে একত্ব রয়েছে। শেষ গানটির 'অমারাত্রির দুর্গ তোরণ' 'ধূলিতলে ভগ্ন হয়ে যাওয়া'র মধ্যে এবং অন্যটির 'কুহেলিকা উদ্ঘাটন' করে প্রকাশ-এর মধ্যেও নূতন জীবনের ভিতরে প্রবেশের আকুতি গভীর হয়ে উঠেছে এবং তার জন্যে বাধামুক্তির সংগ্রামে শৌর্যবীর্যভরা তেজের ঔজ্জ্বল্যই সুরে সুরে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

গতি জীবনের পরিচয়। জন্মদিন থেকেই এই গতির মুখে এসে আমরা পড়ি। বাধায় ঠেকে ঠেকে চলি। জন্মদিনের গান তাই বাধা জয় করে চলারই গান। বাধা জয় করাটাই একটা সৃষ্টি। সৃষ্টি আনে নূতনত্ব। মহামানবের গানের সঙ্গে নূতনের অভ্যুদয়ের গান পাশাপাশি চল্‌ছে। তাতে বিশেষ করে সূচিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ সেই মহাজীবনেরই উদ্‌গাতা, যিনি অভয় মন্ত্রের প্রেরণায় অপ্রকাশের নানা বাধা ভেদ করে জীবনকে উজ্জ্বল সার্থকতা দিয়ে চলেন নব-নব সৃষ্টিতে। সূর্যের মতন তাঁর রূপবিকাশের লীলাটিই শেষ জীবনের গান দুটিতে রেখায় সুরে নূতন হয়ে উদভাসিত। নয় তো, জন্মদিনকে উপলক্ষ করে নূতন জীবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশটি রবীন্দ্রনাথের নূতন নয়। তাঁর জীবনে বিস্মৃত অতীত অধ্যায়ের পাতায় একটি গানকে তিনি প্রথম 'জন্মদিনের গান' বলে মুদ্রিত করেন। এ ১৩০৬ সনের ঘটনা। গানটি 'কল্পনা' কাব্যের শেষ রচনার পর্যায়ে

পড়ে। কারণ, তার পরে মাত্র আর দুটি গান আছে। এর তলাতে কিন্তু তারিখ দেওয়া নেই। তার আগে এবং পরের অনেক কবিতা ও গানের তলায় তারিখ রয়েছে। মোটের উপর ধরে নেওয়া যেতে পারে, গানটি ঐ সময়েরই। কাগজে পত্রে লিখিত মতে ১৩১৭ সনে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কবির 'উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে' পড়ার দিনটিতে প্রথম জন্মোৎসব পালিত হয়। নিজের জন্মদিনটিকে তার দশ বছর আগে কবি মনের একান্তে স্মরণ করেছিলেন, এবং সেদিন পরম আরাধ্যের নিকট তাঁর যে নিগূঢ় প্রার্থনাটিকে কথা ও সুরের রূপ পরিয়ে নিভৃতে অর্ঘসহ ধরেছিলেন, তা হল এই ঃ—

জন্মদিনের গান

(বেহাগ, চৌতাল)

ভয় হতে তব অভয় মাঝারে
নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্য সদনে
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে, হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা মাঝে.
আমার স্বার্থ হইতে, হে প্রভু,
তব মঙ্গল কাজে,

অনেক হইতে একের ডোরে
সুখ দুখ হতে শান্তি-ক্রোড়ে
আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে।

কবি নিজে যেমন সেদিন নিভৃতবাসী ভাবলোকের কবি হয়ে জনান্তরালে ছিলেন, তাঁর গানও ভাবের বীজ বহন করে পড়েছিল নিভৃতেই। কবি নিজে যখন বহির্বিশ্বে প্রকাশমান হয়ে বৃহৎ রচনা জগৎ সৃষ্টি করলেন, তখনও তাঁর সৃষ্টির বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এরচনাটি পড়েছিল ঢাকা। 'জন্মদিনের গান' হিসাবে আর এর প্রসিদ্ধি হল না কোনো দিনই। না কবির কাছে, না অন্য কারোর কাছে। কিন্তু আর যেখানেই অবিচার ঘটুক, ইতিহাসের কাছে এ গানটি বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে এর ললাটলিপির জোরে। এ যে কবির 'জন্মদিনের গান'—তাঁর নিজের দেওয়া নাম! জন্মদিনের দেশব্যাপী আসরে 'হে নূতন' ও 'ঐ মহামানব আসে' গান দুটির সঙ্গে 'ভয় হতে তব অভয় মাঝারে নূতন জনম দাও হে' গানটিরও সমভাবেই প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আর একটি কথা, সকলের জন্যেই কবি রেখে গিয়েছেন তাঁর গান, তাঁর সকল রচনা। স্বাভাবিক গতিতেই সকলের মধ্যে তার প্রসার বাড়ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর গানের সুর বিশুদ্ধ রাখার কথাও যেন আমরা মনে রাখি। শেষ জীবনে এইটি ছিল তাঁর বিশেষ সতর্কতার বিষয়। সুর

তিনি ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। সুর রক্ষা করে চলাই আসরের মুখ্য কাজ। সেটি আমরা যে-কোনো আসরেই দেখতে পাব। নাচ-গান-অভিনয়-কথকতা যত কিছু চলতে থাক্, সব কিছু ব্যাপারের ফাঁকে ফাঁকেই বাজতে থাকে একটি সুর —যেন সানাইয়ের সেই বাঁধা তান। শুধু কবির 'গানের সুর' নয়—তাঁর এই ইঙ্গিত ধরে জীবনের সকল সাধনার মূল সুর সম্বন্ধেই আমাদের বুঝে চলতে হবে।

কবির জন্মতিথির আসরটি সেই মূল সুরটি সম্বন্ধেই আমাদের সচেতনতা আনে বছরে বছরে। স্বতন্ত্রভাবে যদিও এই দিনটি প্রাধান্য পেয়ে থাকে, কিন্তু কবির আসরের সার্থকতা দেখতে পাই অন্যভাবে। সেটি স্বাতন্ত্র্যে নয়, সুসংগতিতে। প্রতিদিনের অন্যান্য উপলক্ষেও অন্য আরো দশটা আসরের দশরকম বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীত ও রবীন্দ্র-রচনার আবৃত্তি আমাদের পক্ষে এখন এমন হয়ে উঠেছে যে, তা না হলে কোনো উৎসবই সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর গান 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'। 'সবারে' তিনি 'আহ্বান' করে ফিরেছেন, আজ সবাই তাঁকে আহ্বান করে ফিরছে—

সবারে করি আহ্বান—
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ।
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা হোথাকার রাতি
করুক নব জীবন দান॥

আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণ দীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান॥

এক সময়ে কবি লিখেছেন ঃ—

গানের ভিতর দিয়ে যখন
দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি
তখন তারে জানি।

গানের ভিতর দিয়ে তিনি যে কী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুবনকে দেখেছেন, আজ তার সমস্ত পরিচয়ই আমাদের সামনে সংগৃহীত, সে সব আছে তাঁর গীত-সাহিত্য, স্বরলিপি ও রেকর্ডে। সুর ও বাণীর আলোচনা থেকে আমরা তাঁর সেই 'চেনা' ও 'জানার' কিছু সন্ধান পেতে পারি। কিন্তু চাই তাঁর মতো গুণীর মরমী মন; নয় তো ফিরতে হবে তাঁর আসরের বাইরে বাইরে। আনন্দলোকে প্রবেশ পথ খুঁজে পাব না। সে এমনি এক লোক, আর তার মধ্যে বসে আছেন এমনি এক গুণী, যাঁর রহস্যের পার না পেয়ে কবির মতো গুণীও গেয়ে ফিরেছেন ঃ

কেমন করে গান করো, হে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।

ব্যাকুল হয়ে বারে বারেই বলেছেন—

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে,
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে।

* * *

আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা
উঠবে ফুটে সারে সারে।

ভয় ছিল কবির, পাছে এত গান আর সুরের মধ্যে কোনো গান বা সুর হারিয়ে যায়, মনে না পড়ে। ১৩৪২ সন। বসন্তোৎসবের দিন। আসর বসেছে আম্রকুঞ্জে। সন্ধ্যার ছায়ার গায় পূর্ণ চাঁদের সুনিপুণ কাজ—যেন পাথরের পর্দায় অদ্ভুত জালি, মাটির আল্‌পনার সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেছে। আম্রকুঞ্জের আমের মুকুল আর শাল-বীথির শাল ফুলের গন্ধ, সুরভিত দক্ষিণ হাওয়া দোলা লাগছে দিকে দিকে। কবি উৎসবে আসবার একটু আগে গান লিখে এনেছেন। উৎসবে বসেই সুর দিয়ে গাইলেন—

আমার বনে বনে ধরল মুকুল
বহে মনে মনে দক্ষিণ হাওয়া।

আবেগ ভরা টানা টানা সুর। এখনও হয় তো তার রেশ অনেকেরই কানে বাজবে। কিন্তু পরদিন অন্যকে শেখাতে গিয়ে সে সুর বদল হয়ে গেল অনেকটা। এজন্যেই গান তৈরী হলেই গান শেখাতে তিনি ব্যস্ত হতেন। গাইয়েদের কাছে দূত প্রায় হাজিরই থাকত। নিজেকে যেমন রেহাই দিতেন না, গাইয়েদেরও নয়।

এই ১৩৪২ সনের বর্ষাতেও ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল। 'বীথিকা' কাব্য লেখা হচ্ছে। সেই সময় প্রথম পর পর বেরিয়ে এল চারটি গান—

আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি।
ঐ মালতী লতা দোলে।
মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।
কী বেদনা সে কী জানো, ওগো সুদূরের মিতা।

—প্রথম লেখা এ চারটি গানই সঙ্গে সঙ্গে 'বীথিকা'য় স্থান পেল। শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গলের পালা নূতন পুরানো গান মিলিয়ে সেবার খুব জমে ওঠে। 'কী বেদনা' গানটিতে দুবার দুটো সুর দেওয়া হয়। শেষের দেওয়া কীর্তনের সুরটাই কায়েম রইল। তারপরেই আসর বসল কলকাতায় 'আশুতোষ' হলে। রচিত হল গান—'চলে ছল ছল', 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু' এবং 'মম মন উপবনে'। নাচের সঙ্গে সেবারও পুরানো কবিতায় সুর বসিয়ে গাওয়া হয়—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'। আরো দুটি এমনি দীর্ঘ কবিতা গানের রূপ পেল—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে।
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে।

সমবেত সংগীতের পক্ষে সব কটিই পরম উপযোগী হয়েছিল। শান্তিবাবুর ক্যাণ্ডি নাচও এবারই কলকাতায় দেখানো হয়। তেওড়া তালের 'হৃদয়ে মন্দ্রিল' গানটির সঙ্গেও তিনি খোলের বোলের তালে তালে নৃত্য করেন। 'চলে ছল ছল'

গানটিও নাচের সঙ্গে গীত হয়েছিল। এর আগে 'দেখ দেখ শুকতারা' গানটি ঐক্যতান-বাদনে এবং নাচে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি শরতের গান, আসর হচ্ছে বর্ষার। তা ছাড়া বৈচিত্র্য দরকার। কিন্তু ঐ জমাট নাচটার উপর ছিল সকলের আকর্ষণ। কবি সুরাহা করলেন। সুর ও তাল বজায় রেখে, কথা দিলেন বদলে। শুকতারার আলোধারার ছন্দে এবার আসরে বইল ছলছল জলধারা।

দু বছর পর। ১৩৪৪ সনের আশ্বিন। আসর বসবে কলকাতায় 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে। নূতন আসরের ডাক শুনেই গানের বলাকা পাখা মেলে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে :—

'মধু গন্ধে ভরা', 'আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি', 'চিনিলে না আমারে কি', 'আজি গোধূলি লগনে বাদল গগনে', 'বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে', 'মনে কী দ্বিধা', 'মেঘছায়ে সজল বায়ে', 'গোধূলি লগনে মেঘে', 'প্রাণের মাছে সুধা আছে', 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়', 'যায় শ্রাবণ দিন', 'ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী', 'আমার যেদিন ভেসে গেছে', 'আমি যখন ছিলেম মগন', 'আজি পল্লী বালিকা' প্রভৃতি। সুর এবং তালের বিচিত্র কারুকার্যে খচিত ঐক্যতান-বাদন জমাবার গান এবারও বাকি রইল না। দেখা দিল দেশ-মল্লারে মিশ্রিত 'এসো শ্যামল সুন্দর' গানটি। সঙ্গীতভবনের সেতারের অধ্যাপক শ্রী সুশীল ভঞ্জ পূর্বেই সেতারের গৎ শুনিয়ে এ বিষয়ে কবিকে কিছু সাহায্য করেছিলেন।

একদিক দিয়ে গাইয়েদের চেয়ে বিপদ ছিল বেশি বাজিয়েদের। এস্রাজই ছিল সঙ্গীতের প্রধান যন্ত্র। বয়সে নবীন কিন্তু বিশেষ গুণশালী এস্রাজের অধ্যাপক শ্রীঅশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কবির শেষ বয়সের আসরে যন্ত্র-সংগীতের প্রধান সহায়কদের অন্যতম। তাঁর মুখেই শোনা,—'ছায়া'তে বর্ষা-মঙ্গল হচ্ছে ; গান হয়েছে অনেক, সুরও তার অনেক, একটু আগেই তা বলা হয়েছে। মহড়ায় শান্তিনিকেতন থেকে যতবার ঘসে মেজে নেবার নেওয়া হয়েছে, আবার সকালে সেদিন জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে বসেও মহড়া হল। অশেষবাবু নিশ্চিন্ত ; দুপুরের ফাঁকে গেছেন নিজের বাসায়। আধঘণ্টা আগে ফিরেছেন একেবারে ষ্টেজে। পৌঁছেই শোনেন—সঙ্গীন ব্যাপার! নূতন গান তৈরী হয়েছে। সুর বসানো হয়েছে, দলকে শেখানোর পালাও শেষ। তাড়াতাড়ি যন্ত্রীকে সুর বেঁধে নিতে হল তক্ষুনি। গানটি ছিল—'থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ'। অশেষবাবুই বলছিলেন—গুরুদেবের ভালো ছিল তো সবই, কেবল আমাদের ভয় ছিল ঐ একটি। খেটেখুটে যত ঠিকঠাক করি, জানতাম বেঠিক হতে দেরি নেই এক মুহূর্ত। এই 'ছায়া'র আসরেই সেবার বাইরের গাইয়ে উমা বসু এবং যন্ত্রী বুন্নন খাঁ, সঙ্গৎকার প্রতাপ মিত্র প্রভৃতিকে নেওয়া হয়েছিল। শ্রীপ্রফুল্ল মহলানবিশ বাঁশি বাজিয়েছিলেন। আরেকবার চন্দন সিং সারেঙ্গীওয়ালাও বাইরে থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন।

১৩৪৫ সনের বর্ষা-মঙ্গলের আসরও হয়েছিল কলকাতায়। তাতে নূতন গান হয়েছিল পাঁচ-ছটি :–

উদাসিনী বেশে।
আমার প্রিয়ার ছায়া।
মন মোর মেঘের সঙ্গী।
আমি কী গান গাব যে।
কিছু বলব বলে এসেছিলাম। ইত্যাদি।

ঐক্যতান বাদনের জন্যে এবারেও সুশীলবাবুর গৎ-ভাঙা গৌড়মল্লার সুরে কথা বসিয়ে গান তৈরী হয় :—

মোর ভাবনা রে কী হাওয়া মাতালো।

১৩৪৬ সন। 'মায়ার খেলা'র নূতন পরিকল্পিত অভিনেয় রূপের জন্যে গান লেখা হয় ডিসেম্বরে—'যে ছিল আমার স্বপন চারিণী' ইত্যাদি কয়েকটিই। কবির আসরে শেষ দিকে প্রাধান্য লাভ করেছিল নৃত্য। নৃত্যনাট্য রচনা ও তার সুর নিয়ে কবি এক এক সময় একেবারে বিভোর হয়ে থাকতেন। 'মায়ার খেলা'য় গানের আবেদনই ছিল প্রধান। সেই থেকে তাঁকে যে গানের নেশায় পেল, তার জের চলল কিছুদিন। সেবার ফাল্গুন থেকে চৈত্রের শেষ অবধি কবি গান বেঁধে ছিলেন শুধু গানের নেশাতেই। তাঁর গানের প্রতিভাময়ী ছাত্রী শ্রীমতী অমিতা সেন (খুকু) ছিলেন কাছে। আশ্রমে গানের অধ্যাপিকা হয়েই তিনি এসেছিলেন। বহুদিন পর তাঁকে ফিরে পেয়েছেন—কবির সুরের উৎস খুলে

গেল। এবেলা-ওবেলা গান দেখা দিতে লাগল। বসন্তোৎসবের প্রারম্ভ। ঋতুরাজ এনেছে আনন্দের উদ্বেলতা, চারদিকে রঙের ফোয়ারা। কবির গানেও তেমনি বিচিত্র রাগরাগিণীর ধারা উছলে উঠল,—কোথাও মিল, কোথাও অমিল, ছন্দই বা কত রকম! কবিতায় বসল সুর, গান হয়ে দাঁড়ালো 'ঋতুরঙ্গে'র কবিতা—

ওগো কিশোর আজি
তোমার দ্বারে পরাণ মম জাগে।

কবি থাকেন 'কোনার্কে'। 'সোনাঝুরি'-ফুলের রেণুতে উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণ ছেয়ে গেছে। আশ্রমের পথে পথে বিছানো 'শালের রেণু'। নূতন পাতার শ্যামল আভা চোখে বুলায় মায়ার অঞ্জন। তার মধ্যে—

এই উদাসী হাওয়ার পথে মুকুলগুলি ঝরে
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি
লহো লহো করুণ করে।

—চলেছে এমনি ঘন উন্মাদনার সুর। তারই মধ্যে এক-একদিন এক এক মুহূর্তে লাগত কী বিষাদের ছোঁয়া। বসন্ত-প্রকৃতির নিগূঢ় ঔদাসীন্য যেন ধরা দিত এসে এক লহমায়। কবি শেখাচ্ছেন, শুনতাম—'যদি জীবন পূরণ নাই হল মম'। সুরটি ছিল নূতন ধরণের, আর্তিভরা। সে সুর কখন এসে ছুঁয়ে যেত ছোটো ছোটো জীবনের কূল; বেড়া ভাঙত, মুক্তির আভাস পাওয়া যেত, জীবন-টাকেও মনে হত কোন সুরের আসর—বাস্তবে যাকে

ধরা ছোঁয়া যায় না ; আনন্দের মধ্যে বেদনার মধ্যে ঝঙ্কার যার উপলব্ধি করতে হয়, আর কবিরা যার সঙ্গত যান শুনিয়ে কিন্তু নিজেই নিজের কূল পান না—

আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে।

একবার কবি গান বাঁধেন—

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দ বন্ধনে।
ও যে সুদূর রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান।

পরক্ষণেই আবার বিহ্বল হয়ে গেয়ে ওঠেন—

বাণী মোর নাহি
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি।

কখনো বা সে সঙ্গতে কবি শম খুঁজে পান না, মানে বোঝেন না। তবু নিজের গানেই দেখতে পান কার স্মিত হাসির আভাস, আসর জমে উঠেছে, আরো কে যেন গাইছে, বিশ্বভুবনকে আকুল করে নিয়ে চলেছে তার সে তানে, সে অশ্রুত সুরের বাঁধনে। তিনি সেই 'সাধনার ধন'কে 'অজানা সাধনে' লাভ করেন। গানে বলেন—

আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে
তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি
অজানা সাধনে।

* ঙ * *

বাঁশরি বাজাই ললিত বসন্তে
স্নদুর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে।

—মানুষের জীবনের যত ভাঙন-গড়ন, দীর্ণতা-জীর্ণতা মধুর হয়ে বেজে ওঠে কবির গানে; আশে-পাশের ক্ষুদ্র মানুষও সঙ্গতি খুঁজে পায়—যখন তাঁকে গাইতে শুনি—

তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে স্নপ্ত রাতে।
আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে।

পর পর এমনি কতক গান এসে গেল সেবার। গানগুলিতে স্নরের কাজই বড়ো। কিন্তু কবিতাও তার দখল ছাড়ে না। অবশেষে দোটানায় পড়ে কবিকে রফা করতে হল। কিছু কিছু অদল-বদল ঘটিয়ে 'সানাই' কাব্যে তাদের কাব্যরূপ রক্ষা করে তবে তাঁর মনের দুমুখো টান থেকে পান নিষ্কৃতি। ১৩৪৬ সনের বর্ষার গানগুলিও বৎসর-শেষে ঐরূপ ব্যবস্থাতেই আসন লাভ করেছিল ঐ বইটিতেই। এসব গানের জোয়ারের সময় ছোটো ছোটো টুকরা চিরকুটে অনেক গান কবি লিখতেন; শেখাবার সময় সাকরেদ্‌দের তা দিতেন। শান্তিবাবু ও শৈলজাবাবুর কাছে এরূপ কতগুলি লেখা আছে। তার মধ্যে আসল গানের রূপটি থাকার কথা। 'গীতবিতানে'র গানগুলিতে কোনো কোনো স্থলে রয়েছে পরিবর্তিত রূপ। এই পর্বে খুকু দেবী ও প্রবীণ

শৈলজাবাবুর উত্তরায়ণে দৌড়োদৌড়ির অন্ত ছিল না। দেখে মায়া লাগত। আর, শান্তিবাবুর ক্ষেত্রে এরূপ গানের চাপের উপরেও ছিল নাচের ঝক্কি। নানাদিকই তাঁকে সামলাতে হত।

তখনো কবির জীবনে শেষ বছর আসেনি। ১৩৪৬ সনেরই শ্রাবণ। বর্ষা-মঙ্গলের দেরি হচ্ছে। আর দেরি করা চলে না। কিন্তু কবির ভাণ্ডার শূন্য। নূতন গানের রণন নেই। উৎসবের উৎসাহেও মন্দা। কিন্তু রীতি তো রক্ষা করতেই হবে। কবির কথামতোই মহড়া বসল। বর্ষার পুরানো গান। শৈলজাবাবু শেখাতে লাগলেন। 'নাট্যঘরে' কদিন মহড়া চলছে। ভালো লাগছে না। 'আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া', 'শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে'—এসব গানে আর মন ভরছে না। কবি যখন থাকবেন না, তখন না হয় পুরানো নিয়েই চলবে। তিনি থাকতেও কি তাই হবে! নূতন না হলে চলবে না। কবিকে বলা হল—এবার ধর্মঘট হবে। জীর্ণদেহ, ক্লান্ত কবি ; বেশি ক্লান্ত বোধহয় গানেরই রিক্ততায়। কিছুতে আসছে না যে, বেজে উঠছে না সুর। বললেন—নাঃ, এবার আর পারব না, ও দিয়েই চালিয়ে দাও। কিন্তু দাবি চলতে লাগল—গান চাই। অবশেষে একটি গান তৈরী হল—

ওগো সাঁওতালী ছেলে।

এক পসলা বৃষ্টি দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পরে আনে রস-প্লাবন,

শুষ্কতা দেয় ঘুচিয়ে। একটু সুরের হাওয়া, সুরধুনীর দোলা জাগালো মনে। এল গান—'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'—তারপরে একটানা এল চার-পাঁচটি। পুরানো গানের ছাঁটাই চলতে লাগল, মহড়া জমতে লাগল নূতনে। আটদশটি যেই হল, চারদিকে রব তুলে দেওয়া গেল—এবার শুধু নূতন গানেই হবে বর্ষা-মঙ্গল উৎসব। একটা সাড়া পড়ে গেল। গুরুদেব প্রতিবাদ করে উঠলেন—না, না। যা তৈরী হয়েছে, তার বেশি আর হবে না। আবেদন হল—একটু রাগিনীর বৈচিত্র্য হলে মন্দ হত না। বোধহয় কথাটা মনে ধরল। উৎপাতকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন বেহাগের পরম ভক্ত। গুরুদেব তা জানতে পারলেন। তৈরী হল—

আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
যে কথা শুনায়েছি বারে বারে।

আরেকজন—মুখে রা নেই, কিন্তু এদিকে বল্‌গা মানে না মনের দাবি। গুরুদেবের বুঝতে বাকি রইল না। তিনি জানতেন,—অন্যজন গানের গুণী; ভৈরবী, ইমন, মল্লার, কাফি, কানাড়া—নানা মার্গ সুরে তাঁর রুচি। গুরুদেব অগত্যা আরো গুটিকয়েক গান রচনা করলেন। আড়ালে আবার চলল গবেষণা। বের করা গেল—গুরুদেবের গানে বাগেশ্রী বেশি নেই। বলা হল সে কথা। পরদিনই দাবি পুরল 'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা' গানে।—তারপরে যেন একেবারে পড়ল ছেদ, অন্তত গুরুদেবের আকারে-ইঙ্গিতে

এমনি ভাব! কিন্তু এদিকে যে আসলই বাকি,—বাউল! এবারে যে বাউল সুরই নেই! আসর জমবে কী দিয়ে। কথাটা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কবি-মনের একতারা উঠল বেজে, গান বেরিয়ে এল—'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, পাগল আমার মন জেগে উঠে'। একটি নয়, দুটি নয়, চোদ্দটি নূতন গান হয়েছে—আর কথা চলে না। মরিয়া হয়ে শেষ দাবি করা গেল—ষোলো কলা পূর্ণ হতে যে আর সামান্যই বাকি। তখন শেষ গানটি পাওয়া গেল—

ওগো তুমি পঞ্চদশী পৌছিলে পূর্ণিমাতে।

ষোলো পূর্ণ হল না, কিন্তু ক্ষোভেরও কিছু রইল না। তবু বাইরে ক্ষোভের সুর থামে না। কথাটা তখনো চলছে—ষোলোটা হলেই হত ভালো। কারণ, উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন-তেন-প্রকারেন তবিল বাড়িয়ে রাখা,—যতটা মিলে। যা পাওয়া গেল জমার ঘরে তাই তো থাকল। সুধায় যে আর আশ মেটে না। তাই ফাঁকে-ফাঁকেই চলছে কিছু-না-কিছু তাগাদা।

এবারে দিলেন জোর বকুনি। কিন্তু কাব্যের কলায় শেষ দাঁড়ি টেনেও যে কবির অবসর নেই। নয়ন-পল্লবে স্বপ্ন জড়িয়ে ধরে, গান আসে থেমে, 'প্রিয়ার মিনতি সম' ক্লান্তি আসে নেমে বিশ্রাম-সুখের আশ্বাস দিতে। কিন্তু তবু ভিতর থেকে বাইরে থেকে কবির প্রতি আহ্বানের শেষ হয় না। সামনের দাবিদারদের বকুনি দিয়ে যতই দিন ভাগিয়ে, 'স্বপ্ন-

স্বরূপিনী'কে 'রে মোহিনী রে নিষ্ঠুরা' বলে যতই দিন গালি, দাবি যে দ্বারে এসে হাজির। স্বপ্ন-স্বরূপিনী প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবনেও ঘুমে-জাগরণে কেবলই বীণার তারে প্রাণের দ্বারে দেয় আঘাত। 'কল্পনা' কাব্যের পরেও এই শেষদিকে গানের প্রবাহ-বেগে এইবারই তাই দুদিন আগে গাইতে হয়েছে—

স্বপ্নে আমার মনে হল
কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে (হায়)

পথিক এল দুই প্রহরে
পথের আহ্বান আনি ঘরে।

সে দাবি ঠেকাবার চেষ্টা কবি করতেন বটে, কিন্তু পারবেন কেন? 'পশ্চিমবঙ্গের কবি'-র সে 'অপ্রতিহত জোর' কোথায়?—শেষ দাবির ফলও ফলেছিল, তবে, একটু দেরিতে। সকলের উল্লাসের মধ্যে রাত্রিতে নূতন গানের মহড়া জমতে লাগল; আর 'নাট্যঘরে' নয়, এবার কবিরই 'পুনশ্চ' গৃহে। সেই শেষবার নূতন গানের বন্যা নেবে এসেছিল। উৎসব সারা হল, কিন্তু সুরের ঢেউ থামল না। ছল্‌কে ছল্‌কে উঠে দিয়ে গেল আরো দুটি গান:—

বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে।
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা।

আবার এক আসর জমানো হল। কবিরই মন বুঝে প্রস্তাবটা তুললেন শৈলজাবাবু। শেষের নূতন দুটি, আর মহড়ার শুরুতে শেখানো আটদশটি পুরানো গান নিয়ে সেবারই গ্রন্থাগারের দাওয়ায় বসল—বাসী বর্ষা-মঙ্গলের পালা।

এই পর্বের পূর্বোক্ত 'স্বপ্নে আমার মনে হল' গানটির কথায় একটি কথা মনে পড়ে। কিছুদিন পর। বেলা ৯টা ১০টা হবে। বৃষ্টি নেমেছে। গান-প্রার্থীদের একজন তাঁর আপিসের পথে আশ্রয় নিয়েছে—'উদয়ন'-এর একতলায়। রেডিয়ো চলছে। কান পাতল। দুএকটা গানের পরই বেজে উঠল পরিচিত গানের সুর। নারীকণ্ঠে গান ভেসে এল—'স্বপ্নে আমার মনে হল'। স্থান কাল গেল গুলিয়ে। কে গাইছে, কোত্থেকে—ঠিকঠিকানা নেই। শ্রোতার কেবলই মনে হতে লাগল—একি সত্য, না, 'স্বপ্নে আমার মনে হল'। বর্ষার মেঘভার, দিনের উপর রাতের আবছায়া ঘেরা। সেই মায়ালোকে সেদিন দরদভরা মধুকণ্ঠের ঐ গান কথায় ও সুরে এমন গভীরে আঘাত করল যে, তার আর সান্ত্বনা মিলে না। আরো যখন মনে হতে লাগল, এ গান সেদিন তৈরী হয়েছে এই কাছের ঘর থেকে; এ সুর-ভাঁজা শুনেছি প্রথম স্বকর্ণে, আর, এর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে এক অদৃশ্যকোণে একটি দাবির ছোট্ট ছোঁয়া। একটু পরে গান থামল, ঘোষক জানাল, লক্ষ্ণৌ রেডিয়ো থেকে—গাইলেন বাঙালী মেয়ে, খুব সম্ভব নামটি ছিল পূর্ণিমা দেবী। কিন্তু উদয়নে দাঁড়িয়ে

বিমুগ্ধ হতবাক্ শ্রোতাটি কেবলি থেকে থেকে ভাবতে লাগল, এই কবি আমাদেরই গুরুদেব, রয়েছি আমরা তাঁরি কাছে। দোসর ব্যক্তিটি ছিলেন তখন গুরুদেবের কাছে গানের সুর শিখতে ব্যাপৃত। তিনি শুনলেন ব্যাপারটা এবং গল্পচ্ছলে গুরুদেবকেও শোনালেন। গুরুদেব একটু হেসে কৌতুক করে বললেন,—ওঃ, তাই নাকি? তবে তো সুরটা পাল্‌টে দিতে হবে!—এমনি ছিলেন মায়াবী।

বছরের পর বছর এসেছে, উৎসব এবং অন্য উপলক্ষও এসেছে অনেক; কবি সাড়া দিয়েই এসেছেন, গানে গানে করেছেন সুধাবর্ষণ। কিন্তু শেষ বর্ষা-মঙ্গলে—১৩৪৭ সনে,—এর ব্যতিক্রম ঘটল। বর্ষাকে একটিমাত্র গানে আহ্বান করলেন,—'এসো এসো ওগো শ্যাম-ছায়া-ঘন দিন'। কিন্তু সেই একটি গানেই দিলেন সব ভরে। আসর মাতানো সুর ও কথায় কে বলবে এ গান তাঁর শেষ বর্ষা-মঙ্গলের শেষ বর্ষা-সঙ্গীত।

সেবার কেউ কোনো গান আশাই করেন নি। কবির তখনকার স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছিল আশঙ্কার কারণ। দাবি আর চলে না। নূতন গান হবে না,—এ সকলেরই জানা। বর্ষা-মঙ্গলের দিনেই গানের দলের অনেকে গেছেন পিকনিকে। এদিকে কবির ভিতরে চিরাচরিত ঔৎসুক্যের সুরটি থেকে-থেকে না বেজে আর থাকতে পারল না। ঠিক দিনটিতে কিন্তু একটি গান ভেসে উঠল। বেলা তখন দশটা এগারোটা।

গানের লোক—পাওয়া যায় না। সুর দিতে-দিতে গানটি কবি শেখাতে বসে গেছেন। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জনা-কয়েক গাইয়ে মিলল। তাঁরাই কোনোরূপে সুরটি একমাটা করে শিখে নিলেন। আবার মহড়া বসল বিকেলে। এই করেই সে গান রাত্রের আসরে চালিয়ে দেওয়া গেল।

বিশ্ব-আসরের বায়না নিয়েই তিনি এসেছিলেন। তারি গাওনা গেয়েই তিনি আসর জমিয়ে গেছেন; কিন্তু সে আসরের মধ্যে কেবল যে তাঁর গুণী জীবনদেবতার বা প্রকৃতির খেলার টানই ছিল, তা নয়; তাঁর ভিতরকার তাগিদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের তাগিদও সময় সময় কাজ করেছে। সে তাগিদের মধ্যে বিবেচনা ছিল, অবিবেচনাও ছিল; বাধা ছিল, আনুকূল্যও ছিল। কবির বিরক্তি ছিল না কোনোটাতেই।

এ সব ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে—কবির উপর তাঁর নিজের গড়া আসরের কী প্রভাব ছিল। স্বতঃস্ফূর্ত নানা গানের সম্ভারে সমৃদ্ধ তাঁর অপরিমেয় ভাণ্ডার। কিন্তু তাঁর অনুষ্ঠান এবং মানুষের তাগিদে পড়েও শেষ বয়সে যে এমন অপূর্ব সৃষ্টি হতে পারে, সেটা একরূপ অবিশ্বাস্য। বছরের পর বছর ধরে তিনি এ কাজ করে যেতে পেরেছিলেন, সে কেবল সেই অনুষ্ঠান ও মানুষের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালোবাসায়। কারণ, সর্বতোমুখী শাশ্বত ভালোবাসাতেই রচিত তাঁর আনন্দের আসর। সে আসর কোনোকালেই কি ভাঙবে? বাঁশি থামবে না, দীপ নিববে না, সুরের রেশ

চলবে প্রাণে-প্রাণে। কিন্তু কে বোঝে সে কথা,—এত গান এত প্রাণ এত দিয়ে এত করে সকলকে বেঁধে রেখেও কবি গেয়েছেন—

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি।
বরষ ফুরায়ে যাবে ভুলে যাবে জানি।
তবু তো ফাল্গুন রাতে
এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলছল এই বহু মানি।

মনে পড়ে আসরের শুরুর দিনের গান। কবি সেদিনও গেয়েছিলেন—'তবু, মনে রেখো'।

শেষ অধ্যায়

'মৃত্যুদূতের পদধ্বনি' শুনতে পেলেন যিনি পঞ্চাশের কাছেই, মারা গেলেন তিনি আশি বছর বয়স পেরিয়ে। প্রায় তিনটি যুগ। শেষাবধি 'মৃত্যুদূতের' ঐ দোহাইটা 'রাখাল বালকের পালে বাঘ পড়া'র মতোই মনে হত। এমন সময় সত্যি সত্যি ঘটল আক্রমণ। প্রথমবারের ধাক্কা থেকে সকলে যখন সতর্ক হল, তিনিও সেই থেকে আয়ু সম্বন্ধে সন্দিহান হচ্ছিলেন।

জ্যোতিষীরা কোষ্ঠী বা হাত দেখতে চাইলে পরিহাসে প্রশ্ন করতেন,—মেয়াদ কদিন? সুরটা রহস্যের, কিন্তু ঔৎসুক্য প্রকাশ পেতে বাকি থাকত না! একটি কথায় তা আরো বেশি ধরা পড়ত। কেবলই জানতে চাইতেন ছেলের আগেই নিজের মৃত্যু হবে কি না! আশ্রমে ছিলেন সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু মঞ্জুশ্রী। তিনি হস্তরেখা-গণনা জানতেন। কবিকে আশ্বস্ত করেছিলেন—পুত্র-শোক তাঁর নেই। আশ্রমের হিন্দীভবনাধ্যক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রী (অধুনা ডক্টর) হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদীজীও কবির সঙ্গে জ্যোতিষালোচনা করতেন। আশির কোঠা পেরুবেন, জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। বিজ্ঞানের একটি শাখাপথ উন্মোচনে যদি বা কিছুটা সাহায্য হয়,—তা মনে করেই তিনি জ্যোতিষের যোগ রেখেছিলেন। তাঁর হস্তরেখা ও কোষ্ঠী তিনি এ বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যবহার করতে দিতেন।

ঠিক এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ভৌতিক বিজ্ঞানের অনুশীলকদের প্রার্থনাতেও সাড়া দিয়েছিলেন—একেবারে

পরিণত বয়সে। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে সেই বিদ্যা নিয়ে তাঁর ছেলেখেলার উল্লেখ। কিন্তু সত্তরের কাছাকাছি বয়সের কথা। কবির বন্ধু শ্রীমোহিত সেনের কন্যা 'বাতায়ন' কাব্যের লেখিকা উমা দেবী এসেছিলেন। উত্তরায়ণের দ্বিতলে প্ল্যানচেটের চক্রবৈঠক বসে। কবি তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সে-সব আলাপের অনুলেখনগুলো এখনো প্রকাশ পায়নি। শুধু 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থখানিতে একটি পত্রে এই চক্র-বৈঠক সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। তাতে প্রথমেই লেখা,—'প্রশান্ত তার চিঠিতে লিখেছে বুলার পেন্সিল দিয়ে যে লেখাগুলো বেরয় তার পরীক্ষা আবশ্যক। আমার নিজের মনে হয় এসব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়।···ইতিমধ্যে পশু´ বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরলো না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা করো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তার পরে যেসব কথা বেরল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না। কোনো এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাব। ······ইতি ১০ নভেম্বর ১৯২৯।'

কবি শান্তিনিকেতনে এসে প্রথমে ছিলেন অতিথিশালার দ্বিতলে, পরে দেহলী-গৃহে ছেলেদের মধ্যে। উত্তরায়ণ গড়ে উঠল। বয়স সত্তর। তখনো সকালে বিকালে হেঁটে চলে আসতেন আশ্রমের মধ্যে। তারপরে এল ঠেলাগাড়ি, তাতে বসে আশ্রম ঘুরতেন। এ ছাড়া রোজ সকলের খোঁজখবর নিতেন। উৎসবে, সভা-সমিতিতে কতভাবে আশ্রমের বৃহৎ

জীবনে মিলিয়ে রাখতেন নিজের জীবন-ধারা। অন্যদিকে আবার উত্তরায়ণে, তাঁর সীমায়ও একটি সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য টেনে চলতেন। নিজের মতো করে খাওয়া, থাকা, লেখাপড়া করা এবং বসে কথাবার্তার জন্যে তিনচারটি খোপওয়ালা একটি ছোটোখাটো ঘর, নিজের দু-একটি পরিচারক—এই নিয়েই থাকতেন পৃথক মহলে। ছেলের সংসারকে মোটেই ব্যস্ত করতে চাইতেন না। কিন্তু মজা ছিল এই, বুঝতেন না তাঁর একলা জীবনযাত্রার জের। বিচিত্র তাঁর বিধান নিয়েই সকলে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যেত। রহস্যচ্ছলে চোখ টিপে ছেলের সংসারকে বলতেন, 'রাজবাড়ি—উদয়ন'। আর 'শ্যামলী' (নিজের ঘরটি), সেটি—'গরিবের আস্তানা'। দু-মহলের পরিচারকদের মধ্যে মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝগড়া চলত। ওদের জিনিস, আমাদের জিনিস—এই সতর্কতা ছিল তাঁর তৈজসপত্রে। বিশ্ব-কবির আত্মসীমার কৃত্রিম খেলা। এদিকে প্রতি সন্ধ্যায় উদয়নের বারান্দাটিতে গিয়ে বসা চাই-ই।

সংসারে ছিল তাঁর 'রথী' আর 'বৌমা'।—তাঁর দ্বিতীয় দেহপ্রাণ। শেষদিকে কবির ছোটোবেলাকার কম লোকই বেঁচে ছিল। আপন লোক বলতে একরূপ কেউই ছিল না। কবিকে স্নেহ করতে পারেন, এমন শুধু একজন ছিলেন বেঁচে। তিনি কবির ছোটো দিদি। বোনেদের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠা। কবির মৃত্যুর মাত্র দুবছর আগে, সেই দিদি (বর্ণকুমারী দেবী) কবিকে একখানি পত্র লেখেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুই ভাই বোনের ঘরোয়া ছবিটি তার মধ্যে মিলে। বোন লিখছেন, ভাইফোঁটা উপলক্ষে—

ওঁ

ভাইটি আমার, ২৭শে কার্ত্তিক সন ১৩৪৬

শুনলুম তুমি জোড়াসাঁকোয় এসেছ সেইখানে গিয়ে ভাইফোঁটা দেবো ভেবেছিলুম কিন্তু হলো না বিকেলে লোক পাঠালুম জানতে সে এসে বল্লে তিনি সকালে চলে যাবেন।

ধিরেন নামে একজন চেনা লোক পেলুম তাকে দিয়ে সব আনিয়ে পাঠালুম কবির যা প্রিয় জিনিস তাই দিলুম আমি বড় তোমার কিছু পাঠাতে হবে না। আশা করি তুমি ভাল আছ ধান দুর্ব্বা ফুল দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম কিন্তু দেখা হল না এই দুঃখ। ইতি— বর্ণ

কবি উতলা হয়ে উঠেছিলেন কৃষাণের জীবনে প্রবেশের জন্যে, —সেটা কাব্যিক উপলব্ধির কথা;—বার্দ্ধক্যের অধিকারে থেকে জীর্ণদেহ নিয়ে নড়াচড়া অসম্ভব। গৃহগণ্ডি থেকে মুক্তির আগ্রহ-বেগ তাঁকে জীবনযাত্রা পাল্টাবার ঝোঁক ধরিয়েছিল। বৃদ্ধ কবি আশ্রমের মধ্যে গিয়ে থাকতে চাইলেন। প্রিয় শিশুদের জীবনের স্বাদ পেতে চাইলেন। শিশু-বিভাগের কাছাকাছি দেহলী-বাসের ইচ্ছা। নিজের হাতে জরুরি চিঠি লিখে দিলেন তাঁর নাতবৌ বড়ো-মা শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে। তিঁনি সে-ঘরের মালিক।

আমি সেদিন ভাবছিলুম মাঝে মাঝে তোমার দোতলাটা অধিকার করে আর একবার শিশুসম্প্রদায়ের নিকট সংসর্গ লাভ করব। সেকথা তোমাকে বলেওছিলুম কিন্তু নিজেকে নিয়ে নাড়াচড়া করা আমার পক্ষে এমন দুঃসাধ্য যে সে ঘটে উঠবে না। ইতি ২৭শে ফাল্গুন ১৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর কিছুদিন পরে তিনি আর একখানা পত্র লেখেন :—

কল্যাণীয়াসু,

প্রভূত পুঁথিপত্র কালীকলম রং তুলি খাতাকাগজ প্রভৃতি উপকরণে ভারাক্রান্ত আমার দিনযাত্রা। হিসাব করে দেখা গেল বিপুল আনুষঙ্গিক নিয়ে তোমার কুলায়টিতে আমাকে কুলাবে না। বিশেষত বর্তমানে তোমাদের পাড়া পূর্বের মতো বিরলবসতি নয়, আমার কাজ এবং অকাজের জন্যে যে নিভৃত পরিবেষ্টনের একান্ত আবশ্যক সে ওখানে মিলবে না। পুরোনো বাসা পুরোনো কাপড়ের মতো, এক সময়ে যা স্বচ্ছন্দে গায়ে হয়েছিল আর এক সময়ে তা আঁট হয়ে ওঠে। অতএব নোঙর তুলতে পারলুম না, যেখানে আছি সেইখানেই বাঁধা রইলুম। অল্পকালের জন্যে বোঝা বয়াবহির উপসর্গ স্বীকার করতে মন রাজি হোলো না। ইতি ২৩।৬।৩৯

কাকামশাই

শরীর চলতে পারল না মনের সঙ্গে। অবশেষে শান্তি-নিকেতনের রবি অস্তসজ্জা নিলেন উত্তরায়ণেই।

দিন যখন তাঁর অবসান প্রায়, নিজের দেহের দখলস্বত্ব পরের হাতে—তেজোদীপ্ত শরীর স্তিমিত প্রায়, শুভ্র সুন্দর শ্মশ্রু-গুম্ফ ক্ষয় হয়ে এসেছে—তখনো মন তাঁর রস-পিপাসু। কুশ্রীতাকে বরদাস্ত করতে পারেননি কিছুতেই। শেষ পঁচিশে বৈশাখ, জন্মদিনে শয্যাগত তিনি। নাতনী—তাঁর 'দিদিমণি', সুচারুরূপে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে, ফুলে চন্দনে জরির পাড় গরদের কাপড়ে চাদরে। কী খুশী, যেন একেবারে ছেলেমানুষ। কেশে তাঁর পাক ধরলেও তিনি সত্যিই পাড়ার যত ছেলে-বুড়ো সবারই এক বয়সীই ছিলেন। তাঁর সেদিনের রূপ যাঁরা দেখেছেন

তাঁরাই জানেন কী সে দেব-দুর্লভ মূর্তি! খোদিত যেন সজীব ভাস্কর্য।

সতর্ক দৃষ্টি ছিল সব বিষয়ে। আহারে-বিহারে, সাজে-সজ্জায়, লেখায়, কোনখানেই এতটুকু ত্রুটি রাখতেন না। দিনের পর দিন অসীম ধৈর্যে বসে থেকে থেকে নাটকের মহড়া দেখেছেন, কেটেছেঁটে ভেঙেচুরে ঠিকঠাক করেছেন, শেষ দিন-গুলিতেও তাঁর ব্যত্যয় ঘটেনি। একেবারে আনকোরা—এমন গাইয়ে, নাচিয়ে এবং অভিনেতা নিয়েও তাঁকে নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়েছে কতবার। মাঝে মাঝে বকুনি, ভ্রূকুটি বিরক্তিও সহ্য করত তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। গানের একটু বেসুরো সুর কানে যেতেই চেঁচিয়ে উঠতেন—আরে থাম্ থাম্। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই টান দিয়ে বসলেন গানে। আর যখন সম্পূর্ণ সুন্দর হত, নিখুঁত হত সব আয়োজন, খুশীর আর অন্ত থাকত না। যে স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখা গেছে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তা তাঁর সারা জীবনের অভ্যাসের ফল।

রোগশয্যার পরিবেশ। সময়ে সময়ে রোগীর মুখের হাস্য-পরিহাসে সজীব চারিদিক, মুহূর্ত পরেই সব বিষণ্ণ গম্ভীর। খেয়া প্রস্তুত। ঘাটে ছায়া নামো নামো।

আশি বছরের কবি। মৃত্যুর দুয়ারে পা। রুগ্নতা ও স্বল্পায়ুর প্রতি বিদ্রোহী। জানাতে চান,—তিনি অসুস্থ নন।

আশ্রমিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন, দেশ-বিদেশের লোকের সঙ্গে আলাপে দিন কাটে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির উত্তরই 'সভ্যতার সংকট'-লেখাটি। সেই-ই তাঁর শেষ বিবৃতি। এই সময়ে রোগশয্যা থেকে তিনি শ্রীনন্দলাল সেন গুপ্তকে সাহিত্য সম্পর্কে একখানি সুদীর্ঘ পত্র দেন। যে কাজ তাঁরই, সে কাজ তিনিই করতেন। বিশ্রামের জন্যে কত অনুরোধ উপরোধ, বাধা, বিতর্ক, আপত্তি, তবু তিনি ঠিক নিজের কাজটি সেরে তবে থামতেন। দুর্বল শরীরে নেমেছে ক্লান্তি, অনুভব করেছেন দৌর্বল্য, কিন্তু তা স্বীকার করাটাতে কী যে সংকোচ! সহজে সেকথা জানাতে চাইতেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায় সেবার গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে নববর্ষে এসেছেন আশ্রমে। জিজ্ঞাসা করলেন, ছুটিতে কবি কোথায় যাবেন। কবি বলেছিলেন, —না মশায়, আমি এই concentration camp-এই থাকব। মাঝে মাঝে বলতেন দৈহিক অক্ষমতার কথা; কিন্তু সে কথা-মাত্র, কার্যত সে অক্ষমতাকে কখনো মেনে নিতে দেখা যায়নি।

শেষবার ৭ই পৌষের উপাসনায় মন্দিরে যেতে পারলেন না। ভাষণে লিখেছিলেন,—আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবের আসন গ্রহণ করতে পারিনি এরকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটল। আমার বার্ধক্য এবং আমার রোগের দুর্বলতা আমাকে সমস্ত বহির্বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

অনেক আগে থেকেই তিনি লেখার মধ্যে সবার কাছে ছুটি চেয়ে এসেছেন, দিয়েছেন বার্ধক্যের দোহাই। বাস্তবে কিন্তু একদিনও সে-ইচ্ছা তাঁর পূরণ হয়নি। মুখে বলেছেন,—আর

পারিনে। কিন্তু আনন্দের সঙ্গেই মিটিয়ে এসেছেন সবার দাবিদাওয়া। তাঁর 'অক্ষমতা'র রস এখানেই।

কোনো লোক দেখা করতে এলে তাকে ফিরিয়ে দিতেন না; ভাবনা থাক, লেখা চলছে—সে সময়টিতে যেখানে এসেছেন সেখানেই থেমে যেতেন। চলতো আলাপ-আলোচনা। ফুরসৎ যেই পেতেন, থেমে-যাওয়া জায়গা থেকেই শুরু করতেন লেখা বা কাজ। যেন ভাবনা বা পরিকল্পনাটা থরে থরে মনে সাজানোই আছে, দেরী শুধ্ বাইরে রূপ দেবার।

লোকের ভীড় হলে সময়ে সময়ে বিরক্ত হয়ে বলতেন,—নিষেধ করে দাও, দেখা হবে না। কিন্তু যেই চোখে পড়ল দেখা করতে এসে কেউ ফিরে যাচ্ছে, অমনি বলে উঠতেন,—ফিরে যাচ্ছে যে! স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত তাঁর নিজেরই নিষেধ। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠতেন,—ডাকো ঢুকিয়ে ফেলি। দেখা কেন পাবে না, আমি কি দেবতা? কিন্তু আর সবাই সাবধান! যে বিরাট, মৃত্যুও বুঝি তার কাছে সহজে ঘেঁষতে পারে না। তবু একদিন কোন্ ফাঁকে মৃত্যুকীট বাঁধে বাসা—পলে পলে ক্ষয় হয় মহীরুহ। মেনে নিতে হয় তাঁকে ছোটো বড়ো সবার শাসন ঃ—

চারদিকে মোর ঠেসে ঠুসে
খাটো করলে দিনকে
যেন তোমার মুঠোর মধ্যে
এক করেছ তিনকে।

ঘড়ি-ধরা নিদ্রা আমার
নিয়ম ঘেরা জাগা
একটুকু তার সীমার পারেই
আছে তোমার রাগা!
কী কব আর রবি ঠাকুর
ভয়ে তরস্ত
এত বড়ো মানুষ ছোট্ট
হাতের করস্থ।

নাতনীকে উদ্দেশ করে রোগশয্যায় রচিত এই ছড়াটিতে কবি নিজেই সেকথা বলে গেছেন।

রোগশয্যার সীমায় কবির অসীম বিশ্ব সীমাবদ্ধ। হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায় তার দেয়াল।

এমনও হয়েছে,—রাতে কবি ঘুমোচ্ছেন, নিশ্বাস খুব মৃদু, এলানো দেহ,—সবাই চমকে উঠছে। এমনি উদ্বেগের দিন। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে দেহযন্ত্রে। আশঙ্কায় রুদ্ধ কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ কথা-বলাবলি, ক্রমাগত খবরাখবর নেয়া। একটু শোওয়া, একটু বসা, আশা নিরাশা।

বেশির ভাগ সময়ই কাটে সোফার উপরে। বসে আছেন তো বসেই আছেন। কী আছে তাঁর চেনা পৃথিবীর ওপারে! কতখানি সময় গেল পেরিয়ে। হঠাৎ একসময়ে চমকে উঠলেন। বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস,—অগোচরে। লোকের সামনে এ ধরনের দুর্বলতা দেখানো,—এ তাঁর কোনো দিনও ছিল না। কিন্তু ভুগে ভুগে মন হয়ে পড়েছিল এমনি। অনুভূতি উপচে পড়তো

কাতরতায়। একটু আবেগের, একটু উত্তেজনার কথাতেই একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

প্রতিদিন আশেপাশের এবং বাইরের খোঁজখবর নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব। নিজে যখন ভুগছেন, রাত্ বারোটা, তন্দ্রা ভেঙেছে, জানতে চেয়েছেন দরোয়ানের না পেট-ব্যথা হয়েছিল। কেমন আছে সে!

মৃত্যুর পূর্বে দেখে যেতে হল কী নিষ্ঠুর হানাহানি, কত অন্যায় অবিচার, দেশে-বিদেশে। যৌবনে দেশের চাষী, গরিব প্রজাদের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের দুর্দশা দেখেছেন, তার কোনো প্রতিকার হল না—জীবন সায়াহ্নে সেকথার আলোচনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। চারদিকের অত্যাচারে হাঁপিয়ে উঠেছিল প্রাণ। মানুষের কাছে দাবী করতেন শুধু একটু ভালোবাসা।—

> আমি চাহি বন্ধুজন যারা
> তাহাদের হাতের পরশে
> মর্ত্তের অন্তিম প্রীতিরসে
> নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
> নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ
>
> —শেষ লেখা

অন্তর থেকে একটা গভীর স্নেহ উপ্‌চে পড়তো। যারা শুশ্রূষা করেন তাঁদের কষ্ট হতে পারে, এই ছিল ভাবনা। রোগ-যন্ত্রণা ভুলে সুযোগ পেলেই ছড়া কাটতেন, শুরু করে দিতেন হাসি-তামাশা। ছড়াগুলি জনকয়েক মিলেই উপভোগ করে যেতো। লিখেও রাখা হত। তেমন কোন উদ্দেশ্য ছিল

না। কবিও ভাবতেন এর আর কি মূল্য। ৪।১২।৪০ তারিখ। সকালে তাঁর সেবারতা পুত্রবধূকে বললেন :—

ডাবও ভালো ঘোলও ভালো
ভালো সজ্‌নে ডাঁটা,
বৌমা বলেন ভাল নহে শুধু
সিঙ্গিমাছের কাঁটা।

মশা এসে কামড়াচ্ছে, হুলের বড়ো জ্বালা। বলে উঠলেন :—

মশা রক্ত খেতে চায় খাক্ ভুয়ো ভুয়ো
কিন্তু খেয়ে দেয়ে কেন দিয়ে যায় হুয়ো।

এমনি ছড়া কাটা চলছিল। এদিকে প্রবাসী থেকে সেদিন তাগিদ এসেছে—কবিতা চাই। সেকথা বলতে গিয়ে কোনো নূতন লেখা তৈরী আছে কিনা জানতে চাওয়া হল। তিনি হেসে বললেন—আছে, কতকগুলো ছড়া। তোমরা তো আমার যা পাও ঠেসে ভরো প্রবাসীতে। দাও নিয়ে এগুলোও!

কোনগুলি, দেখি! —ছড়া পড়ে রচনা-রক্ষক উল্লসিত হলেন। মজার রসে ভরা নূতন ছড়াগুলি। কবি বিস্ময়ে বলে উঠলেন—আরে ঠাট্টা করে বল্লুম আর তুমি লাফিয়ে উঠলে? না, না, হবে না। নিছক ছেলেমানুষি, এ কি বের করার? যতই তাঁকে বলা যায়, এ ছড়া সবাই নেবে আদরে—কে শোনে! ভাবছেন, এ ছড়া দেখে লোকে ভাববে বুড়ো বয়সের পাগলামি। অনেক করে বলাতে প্রকাশের অনুমতি মিলল। কী উপলক্ষে কোন প্রসঙ্গে কখন লেখা, সে বিবরণ সঙ্গে দিতে

হবে, না হয় লোকের রস গ্রহণের সুবিধে হবে না। এমনি নানা গল্প হচ্ছে, কৌতুকভরে বলে উঠলেন—

তুলো ধুনতে গেলে পরে, কতকটা সেই তুলো
লেপের মধ্যে প্রবেশ করে—কতক ঢাকে ধুলো।

ছড়া রচনার শেষ কবিতাটি :—

আকাশ নিঠুর
বাতাস নীরব
কৃপণ মাটির পরে
শিকড় হা হা করে।

চারদিকেতে ফেটে গিয়ে চৌচির সে মাঠটা,
ফুলের খবর নিতে এলে শোনায় যেন ঠাট্টা।

দখিন হাওয়া শুধায় যদি
কেমন আছে বলে
শুকনো পাতার খসখসানি
শুধু জাগিয়ে তোলে॥

শুশ্রূষাকারিগণকে সজীব রাখতে চাইতেন, যেন উল্টে তিনিই করতেন তাদের শুশ্রূষা। নিজে অনেক সময় যন্ত্রণা সহ্য করতেন, তাদের দিতেন বিশ্রাম। খাবার দিয়ে কুকুরটাকে আদর করতেন, কৌতুহলে দেখতেন চড়ুইটাকে। তাদের বিষয়ে লোককে করতেন প্রশ্ন। এ দেখে একদিন হাসির ছলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বুড়ো বয়সে লোকে ভাবে পরকাল। জপে ঠাকুর দেবতার নাম। আর আপনি আছেন পশুপাখী,

লোকজন হাসি-গল্প নিয়ে। লোকে বলবে কী ? মজা পেলেন, হেসে বল্লেন—সত্যিই তো বলবে কী !

আচ্ছন্নতা কেটে যায়,—চেতনা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় অভ্যস্ত কাজ। লীলাসঙ্গিনী ডেকে গেছে বারে বারে। ফুল-ফল, লতা-পাতা, পাখি-পাখলি, আলো-অন্ধকার, জীবন-প্রবাহে উচ্ছলিত বিস্ময়কর এই ধারা নিত্য-নূতন আঘাতে নিয়ে গেছে তাঁকে অকল্পিতের দ্বারে। আজ কোথায় সে-সব। চারিদিকে দেখেন অন্ধকার।

গণ্ডিটানা ঘর, প্রবাহ তার ক্ষীণ। 'আধমরাদের ঘা' দিয়েছেন যিনি, জীবনের এই গ্লানি কী করে তিনি সইবেন। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ে--আর কতদিন !

রোগের কাতরানি এ নয়, এ-ক্ষোদাক্তি প্রকাশের অক্ষমতার। থাকত যদি সে সামর্থ্য, রোগের জন্যে ক্ষুণ্ণ হতেন না। রোগ-শয্যা হয়ে উঠত সৃষ্টি আগার—সে অসম্ভবও সম্ভব করে গেছেন সাধারণের কাছে, মন মানেনি। রোগ-শয্যার লেখা 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে'—ভঙ্গি নূতন, নূতন ভাষা। বিদায়ের বর্ণ-সমারোহ ঢেলে দিয়েছেন কবি শেষের তিনটি কাব্যে। আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বলেন,—'বাইরের খবর, শুনতে শুনতে তুলে নেন পেন্‌টা। খাতা টেনে নেন, শুরু করেন লেখা। কলম যায় কেঁপে, হাতের পেশীর পরে খাটেনা আর ইচ্ছার জোর। কল্পনার সহজবেগে বাধা আসে। আলো আছে, তেজ নেই, জড়িয়ে আসে আলস্যের ভার। তবু সৃষ্টি চলে। দু-লাইন লিখেই থেমে যান। ফুটে ওঠে কাতরতা। নিভতে গিয়েও

শিখা জ্বলে ওঠে। মনের ভীড়-করা কথা বলে যান মুখে মুখে। বৃদ্ধ ছুটে চলেন,—কালের সঙ্গে পাল্লা। লোকে অনুরোধ করে বিশ্রাম নিতে, নাতনি এসে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত। পাশ ফিরতে হয় পরের সাহায্যে, পাটুকু অবধি পারেন না উঁচু করে রাখতে। ধপ্ করে শিথিল-পেশী পা নীচে যায় পড়ে। অনেক পীড়াপীড়িতে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ভান করেন। যন্ত্রণার জন্যে ঘুমাতে পারেন না ভালো করে। তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকেন। ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে সৃষ্টির ডাইনামো।'

রাত্রিটা কোনোরকমে তন্দ্রায় জাগরণে কাটে, ছটফটিয়ে উঠে বসেন রাত তিনটেয়। এ অভ্যাস তাঁর চিরদিনের। কথা বলতে চান; ইচ্ছে হয় লেখাবার। এক এক দিন লেখাতেনও। অন্য সবাই বলে—'এখনো উঠবার সময় হয় নি।' ঠিক ধরতে পারতেন তিনি। বলে উঠতেন—'আমার তো সন্দেহ, রাত তিনটে, দেখ্‌তো ঘড়ি। নিশ্চয়ই ফাঁকি দিচ্ছিস্ তোরা।' ভুলিয়ে ভুলিয়ে আবার তাঁকে ঘুম পাড়ানো হয়। চোখ বুজে তিনি উৎসুক হয়ে থাকেন কতক্ষণে এসে চড়ুই পাখিটা ঘুরে বেড়াবে তাঁর এই বদ্ধ দরজায়। আনবে প্রথম আলোর বাণী! পৃথিবীর স্পন্দন পাবেন, ডাকে আসবে কত নূতন খবর, লোকজন আনাগোনা করবে, আর সবার উপরে তিনি উজাড় করে দিতে পারবেন রুদ্ধ ভাবধারা।

আশা কিন্তু মেটে না। দুর্বল মস্তিষ্ক বেশি খাটতে নারাজ। দিনের বেলা ভাবতে ভাবতে বলতে বলতে ছিন্ন হয়ে যায় রাতের চিন্তা। আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়েন। নয়তো

সোফায় দেন গা এলিয়ে। বাইরে বিশেষ বোঝা যায় না ; ভিতরে তাঁর কী রোগযন্ত্রণা, মর্মান্তিক বেদনা, নিগূঢ় দ্বন্দ্ব। কপালের শিরায় শিরায় ফুটে ওঠে শ্রান্তি, শীর্ণতা। বুঝতে পারেন, ঘনিয়ে আসছে রাত্রি। সে ঢেকে দেবে দিনের প্রখরতা।

দু-তিনটি মেয়ে পালা করে গান শোনাতে যায়। কানে তখন তিনি ভালো শুনতে পান না। দেখতে পান না স্পষ্ট। মেয়েরা কানের খুব কাছে গিয়ে গান গেয়ে শোনায়। উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ফরমাশ করে করে গান শোনেন, নিজের মনের মতো যে গানগুলি। শুনতে শুনতে বলে উঠেন কখনো— 'ওরে গা, ভালো করে গানটা গা তো। সিন্ধুপারে চাঁদ তো বুঝি আমার জন্যে আর উঠবে না।' প্রাণের গহন থেকে বেজে ওঠে সুর। এত ভালোবাসার পৃথিবী—মৃত্তিকার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি যার ব্যাপ্ত হয়ে থাকতে যায় সাধ, ছেড়ে যেতে হবে তাকে !

সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

—এ তো আর খেলা নয়। দারুণ সত্য, দুঃসহতম বিচ্ছেদের বাস্তব পালা। ছেড়ে যাবার মুখে ভুবনডাঙ্গায় রাস্তার ধারে প্রতিষ্ঠিত নূতন পাওয়ারহাউস দেখে নাতনি নন্দিতা

দেবীকে ঠাট্টার ছলে বললেন—'পুরানো আলো চলল, আসবে তোদের নতুন আলো।'

সবাই একদিন শুনলে গুরুদেব কলকাতা চললেন, অপারেশন্ হবে। যে বয়স, অপারেশন্ করা যাবে কি, তিনি তা সহ্য করতে পারবেন তো—এই শুধু সবার আশঙ্কা। একটু যেন ম্রিয়মান দেখালো গুরুদেবকেও। তবু যেই ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকবেন তাঁর মতে সম্পূর্ণ একমত হয়েই তিনি চলে এসেছেন আজীবন। ব্যত্যয় হল না শেষ সময়েও। ভয় পাবার লোক নন তিনি। দেখেছেন পিতা তাঁর অপারেশন্ করিয়েই ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তবু ভাঙলেন না তাঁর নিয়ম। হার মানবেন না—এই তাঁর জীবনের প্রধান কথা। দেখা করতে গেল আশ্রমবাসিগণ। তিনি উদয়নের দোতলার সেই ঘরটাতে বসে আছেন। কাজকর্মের দায়িত্ব এবং আশ্রম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। যাবার দিন দোতলা থেকে নেমে আসবার কিছু আগে দেখা করতে গেলেন ক্ষিতিবাবু (আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন)। তাঁকে বললেন—'মশায়, দেখছেন তো—চলে যাবার কী রকম আয়োজন হচ্ছে।' অথচ নিগূঢ় আশাও থাকে মনের কোণে। যাবার মুহূর্তেও বলে যান তাঁর 'বাঙাল'কে—'একমাস পরে ফিরবো। দেখো ছড়ার বইটা যেন ছাপা হয়ে থাকে।'

তারপরে একদিন বেরিয়ে এলেন অসহ্য সেই রোগশয্যা থেকে। স্ট্রেচারে শুয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন। আধ-তৈরীর মতো উদয়ন-প্রাসাদ, দূরে কতদিনের দেখা ঐ খোয়াই, কেয়াবন আর তালীবনের পাহারা; নীচে সেই নানারঙা ফুল-বাগান—যে বাগান একদিন তাঁর লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে! নেমে এলেন আরো নীচে—অর্ধচন্দ্রাকারে ঘেরা লাল বারান্দায়। দেখলেন তাঁর শ্যামলা রঙের বাসগৃহ 'শ্যামলী', রাঙা রাস্তা আর দূরে ডাকঘর, হাসপাতাল। মৃদু গুঞ্জরিত গানের সঙ্গে পরিষ্কার ফুটে রয়েছে শান্তিনিকেতনের ছবি। নিঃশব্দে দু-চোখ মেলে আছেন রবীন্দ্রনাথ।

এলেন কলকাতায়, নিজ বাটী জোড়াসাঁকোতে। অপারেশনের আয়োজনের মধ্যেও রচনা করলেন তিনটি কবিতা। কিন্তু যেদিন থেকে বন্ধ হল রবীন্দ্রনাথের স্বীয় সৃষ্টি, সেদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ নেই। চেতনাহীন হয়ে তিনি তিনচার দিন ছিলেন পৃথিবীতে। কিন্তু সে কদিন পৃথিবীকেও যেমন তিনি পাননি, পৃথিবীর মানুষও তেমনি পায়নি তাঁকে। তারপর এসে গেল ২২শে শ্রাবণের (১৩৪৮) বারোটা দশ মিনিট, —পৃথিবীর ইতিহাসে একটি দাড়ি টেনে সে দাঁড়াল।

কোনোদিনও রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু-পথের বীভৎসতাকে কিংবা

তার অনিশ্চয় ভয়কে মনে আমল দেননি। জীবনের প্রথম থেকেই দেখি মৃত্যুর উপলব্ধি তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ ধারায় নানা বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে।

জীবন-মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে পেরিয়ে মানুষ একদিন সেই মহাজীবনের সঙ্গে মিলিত হবেই—এই বিশ্বাস এই অনুভূতি ছিল রবীন্দ্রনাথের, এবং মৃত্যু যখন তাঁর এবারকার সত্তাকে, তাঁর 'আমি'র অস্তিত্বকে বাস্তবতই নষ্ট করে দিতে চলেছে, তখনো সমস্ত দেহ-মনের একান্ত উপলব্ধি, সমস্ত অনুভূতি একত্রীভূত হয়ে উঠল তাঁর একটি বাণীতে :—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।

এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তা'রে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।

বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে, সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে সে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

মৃত্যুকে, মৃত্যুর ছলনাকে কবি স্বীকার করলেন না। মরণের মাঝেও করে গেলেন জীবনের জয়গান।

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	মুদ্রণচ্যুতি	শুদ্ধপাঠ
১৯	১	কে-ইবা	কে-ই বা
১৯	১০	দু টায়	দু-টায়
৩০	২৩	রৌদ্র আভ	রৌদ্র-আভা
১০৫	৪	যে	যে
১১০	২১	তার	তাঁর
১১১	শিরোনামায়	বিচিত্রর	বিচিত্রের
১২১	৯	কবা	করা
১৬০	১০	ভারতীর	ভারতীয়
১৭৩	শিরোনামায়	রবীন্দ্রশাথের	রবীন্দ্রনাথের
১৭৬	তারকা চিহ্নিত	ঙ	*
১৭৬	৮	ভুমি	তুমি

[তাড়াতাড়ি মুদ্রণ এবং নানা বাধা অসুবিধার দরুণ আরো অনেক ছাপার ভুল ও বানানে অসঙ্গতি হয়ত রয়েছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ ত্রুটিগুলো মার্জনা করবেন এই আশা। —প্রকাশক]